সাধিকামালা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সাবিকাম্মাত্রা

Approved by the D. P. I. West Bengal.
[Vide Notification No. 1. T. B. dated 26. 2. 52.]

সাধিকামালা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

প্রথম সংস্করণ : ১৯৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫২

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা

[সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর অতিরিক্ত পাঠ্য]

দাম : বাঁধাই— দুই টাকা
সাধারণ—এক টাকা বারো আনা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক কলিকাতা ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও শ্রীসুখলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লোক-সেবক প্রেসে, ৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

নিবেদন

দেশবিদেশের ষোলটি সাধিকার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী এই পুস্তকে সংগৃহীত। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের ষোলটি সাধিকামণি লইয়া এই পুস্তকরূপ মালা গ্রথিত। 'মণি' শব্দ শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি, দিদিমণি, মা-মণি, দাদুমণি ইত্যাদি। এইজন্য পুস্তকের অধ্যায়গুলির নাম 'মণি' রাখা হইয়াছে। নানা দেশের শ্রেষ্ঠ সাধিকাগণের জীবনচরিত এই পুস্তকে বিবৃত। সাধিকাগণের মধ্যে গৌরী পুরীপ্রমুখ কয়েকজনের সংস্পর্শে আসিবার পরম সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম। তখন বুঝিয়াছি, ইঁহাদের জীবন কত সুমহান্, কত সমুজ্জ্বল! হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের সাধিকাগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, নারীর সনাতন আদর্শ সর্ব ধর্মে, সর্ব দেশে অভিন্ন। মীরাবাই, টেরেসা, সংঘমিত্রা ও রাবেয়ার জীবন কি এক শাশ্বত আদর্শে রূপায়িত নয়? হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান নারীগণকে এই শাশ্বত আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই বর্তমান যুগের প্রধান প্রয়োজন।

অন্য যে সকল আদর্শ দেশে দেশে, যুগে যুগে নারীগণকে বিচলিত, বিক্ষুব্ধ করিয়াছে ও করিতেছে সেগুলি অশাশ্বত ও পরমার্থনাশক। বিশেষতঃ, ভারতে এই ধ্রুব সত্য বারে বারে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাচীনযুগের শবরী, মধ্যযুগের মীরাবাই বা অণ্ডাল এবং বর্তমান যুগের সারদামণির জীবনে হিন্দু নারীর সনাতন আদর্শ প্রকটিত। এই ভারতীয় আদর্শই যে সার্বদেশিক ও সার্বকালিক তাহা বঙ্গবালাগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এই ক্ষুদ্র মণিমালা রচিত। গ্রন্থখানি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িলেই জিজ্ঞাসুর মনে ইহার সুস্পষ্ট প্রতীতি হইবে। মণিমালার মধ্যে কোন পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই। যে কোন সাধিকার জীবনী পৃথক্ ভাবে পড়া যাইতে পারে। শবরী, মীরাবাই ও থেরেসা নিউমান শীর্ষক অধ্যায়ত্রয় প্রবন্ধরূপে যথাক্রমে 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে (আষাঢ়, ১৩৪৯) এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৪৮ ও মাঘ, ১৩৫৪) প্রকাশিত হইয়াছিল। হাই স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণের উপযোগী করিয়া বইখানি লেখা হইয়াছে। যাঁহারা এই সাধিকা-

ষোড়শীর জীবনী আরও বিস্তৃত ভাবে পড়িতে চাহেন তাঁহাদের জন্য পাদটীকায় পুস্তক এবং পত্রিকাবলীর নাম উল্লিখিত। হিন্দু নারীজাতির সনাতন আদর্শের প্রতি আমাদের বালক-বালিকাগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।

এই পুস্তক প্রণয়নে এবং প্রুফ সংশোধনাদি কার্যে অকুণ্ঠিত চিত্তে অশেষ সহায়তা করেছে আমার তরুণ বন্ধুত্রয় পরম স্নেহভাজন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীশিবানীপ্রসাদ মৈত্র। তাহাদের আন্তরিক সহায়তা ব্যতীত আমার পক্ষে বর্তমান ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্ষীণ দৃষ্টি লইয়া এই পুস্তক রচনা সম্ভব হইত না। এই দুর্মূল্যের দিনে পুস্তকখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় কলিকাতা ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী সুহৃদ্বর শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি।

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৫৬
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ,
বেলুড়মঠ, হাওড়া

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বিষয় সূচী

সাধিকামালা

প্রথম মণি

শবরী

মহর্ষি মাতঙ্গ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। তাঁহার শরীর তপস্যার তাপে শীর্ণ ও জরাভারে ভগ্ন। শয্যা-পার্শ্বে শবরী শোকাকুল চিত্তে গুরুর সেবায় নিযুক্তা। মাতঙ্গের মৃত্যু-শয্যায় আসীনা শবরীকে সদ্যপ্রস্ফুটিত রৌদ্রদগ্ধ বনফুলের মত ম্লান দেখাইতেছে। মহর্ষির মহাপ্রয়াণ আগতপ্রায়। পালিতা কন্যা শবরীকে কাছে ডাকিয়া মাতঙ্গ আবেগভরে বলিলেন—"মা, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। আমি পরলোকে যাচ্ছি। মানবদেহে আবির্ভূত শ্রীভগবানের চাক্ষুষ দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটল না। শ্রীভগবান্ রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বর্তমানে তিনি চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সীতার অন্বেষণে শীঘ্র এই আশ্রমে পদার্পণ করিবেন। তুমি ব্যাকুলভাবে তাঁর শুভাগমন প্রতীক্ষা কর। তাঁর দুর্লভ দর্শন প্রাপ্তির পর তুমি জ্বলন্ত অগ্নিতে দেহ বিসর্জন দিয়ে ব্রহ্মলোকে আমার নিকটে আইস।" এই কথা বলিবার পরই মাতঙ্গের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

মাতঙ্গের মৃতদেহের সৎকার সমাপন করিয়া শবরী শ্রীরামচন্দ্রের জন্য আকুল প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিল। শবরী মাতঙ্গের শুধু শিষ্যামাত্র নহে, পরম স্নেহে পালিতা কন্যা। মাতঙ্গ যেমন শবরীকে অশেষ স্নেহ করিতেন শবরী তেমনি একনিষ্ঠভাবে বৃদ্ধ গুরুর সেবা করিতেন। মাতঙ্গ ছিলেন শবরীর গুরু ও পিতা উভয়ই। ঋষির সেবাই শবরীর প্রাত্যহিক জীবনে প্রধান ব্রত। মাতঙ্গের অন্তর্ধানে শবরীর কোমল হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। কিন্তু গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়াই শবরী আশ্রমে জীবন কাটাইতে লাগিল। গুরুর বাক্যই গুরুর শূন্য স্থান অধিকার করিল। গুরু-শিষ্যের মধ্যে স্নেহের বন্ধন সুদৃঢ় ও গভীর না

হইলে কোন শিক্ষাই ছাত্রের জীবনে কার্য্যকরী বা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মাতঙ্গের স্নেহ-সিক্ত শবরী আজ তাই গুরুর অন্তিম উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। মাতঙ্গের মৃত্যুর সময়ে শবরী অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র ছিল। আজ বালিকা আশ্রমে একাকিনী। আশ্রমের সকল স্থানই গুরুর স্মৃতি-বিজড়িত। শবরী চারি দিকে যাহাই স্পর্শ করে বা দেখে তাহাতেই স্বর্গগত গুরুর পুণ্য স্মৃতি মূর্ত হইয়া উঠে। প্রত্যহ প্রাতে শবরী গুরুর নাম স্মরণপূর্বক শয্যাত্যাগ করিয়া স্বীয় হস্তে সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প চয়ন করিয়া পূজার পাত্রে সাজাইয়া রাখে। জুঁই, চামেলি, মল্লিকা, মালতী, গোলাপ, মাধবী প্রভৃতি নানাবিধ ফুলে আশ্রমের উদ্যান পরিপূর্ণ। শবরী মর্ত্যের একটী সুষমা-চন্দ্র। তাহার যৌবনোচ্ছ্বাসিত দেহলতা হইতে কান্তি-কিরণ সদা বিচ্ছুরিত হইতেছে। সে যখন বাগানে ফুল তুলিতে থাকে তখন তাহাকে পারিজাত-বৃক্ষরূপে ভ্রম হয়। পুষ্পচয়নান্তে শবরী আশ্রম-বেদী সাজাইয়া, সচন্দন পুষ্পের অর্ঘ্য তৈয়ার করিয়া রাখে। ভগবান রামচন্দ্র আসিবেন; সচন্দন পুষ্পে সে তাঁহার পাদপূজা করিবে। এই আশায় বুক বাঁধিয়া শবরী দিবারাত্রির প্রত্যেকটী ঘণ্টা কাটায়। আশ্রমের বৃক্ষরাজি হইতে নানা সুমিষ্ট ও সুপক্ক ফল সংগ্রহ করিয়া শবরী বেদীর উপর নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখে। কিন্তু রামচন্দ্রজী আর আসেন না। প্রাতের সূর্য পূর্বের উদয়গিরি ছাড়িয়া মধ্যাহ্নে আকাশ-শীর্ষে উত্থিত হয়, আবার মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিমের অস্তাগিরিতে গমন করে। অর্ঘ্যের পুষ্প ও নৈবেদ্যের ফল শুকাইয়া যায়। দিনের পর দিন অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য এইভাবে নষ্ট হইতেছে। পরম অতিথির অভ্যর্থনার জন্য শবরী সদা প্রস্তুত আছে। সে নিত্য স্নান ও আহার তাড়াতাড়ি সারিয়া লয়, পাছে অতিথি অসময়ে উপস্থিত হন! এত উৎকর্ণ ও আকুল প্রতীক্ষায় রাত্রি অতীত হইত যে, তার চক্ষে নিদ্রা আসিত না। আকুলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শবরী স্নানাহার ভুলিল। আশ্রমের দ্বার সদা উন্মুক্ত আছে, যাহাতে অতিথি আশ্রমে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ আকুল প্রতীক্ষায় দিন যায়, রাত্রি আসে। কিন্তু অতিথি কোথায়? এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিল; কিন্তু রামচন্দ্রজীর কোন সংবাদ নাই। শবরী বাল্য অতিক্রম করিয়া যৌবনে প্রবেশ করিল। যৌবন বিবাহের কাল। কিন্তু, তাহার বিবাহ স্থগিত রহিল। কারণ, বিবাহের ব্যস্ততার মধ্যে যদি স্বর্গের অতিথি আসিয়া হাজির হন তাহা

হইলে অতিথির অভ্যর্থনার যে ব্যাঘাত হইবে! এইভাবে যৌবনও চলিয়া গেল; আর শবরীর বিবাহ করা হইল না। শ্রীরামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় যৌবন তাহার মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টির সুযোগ পাইল না। এইরূপে আদর্শের ধ্যানে আত্মহারা না হইলে কামাদি রিপু জয় করা অসম্ভব। কামক্রোধাদি রিপুকে ভুলিতে হয়, জয় করা যায় না। শবরী তাহার হৃদয়-কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া শ্রীভগবানের চিন্তায় এত তন্ময় হইয়াছে যে, অন্য কোন বিষয়ই তার মনে স্থান পাইতেছে না। অন্য কোন বিষয় সে শুনিয়াও শুনে না; অন্য কোন বস্তু সে দেখিয়াও দেখে না। শবরীর সমগ্র মন রামচন্দ্রে একাগ্র হইয়াছে, এক একটী দিন বা রাত্রি এক একটী বৎসরের মত সুদীর্ঘ মনে হইতেছে। তাহার বার্ধক্য আসিল। দেহে জরা দেখা দিল। দৈহিক লাবণ্য নিষ্প্রভ হইল। শবরী ভাবিল, "প্রভু আমার মত পাতকীকে বোধ হয় কৃপা করিবেন না, আমার মত অকৃতী অধমকে তিনি দর্শন দিবেন না। এই অসম্ভব ব্যাপার নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে না। আমি অবশ্য তাঁহার দর্শন লাভের অযোগ্যা। কিন্তু গুরুবাক্য ত মিথ্যা হইবার নহে। সিদ্ধ-সংকল্প মহর্ষির মনে ত কখনও অসত্য সংকল্প উদিত হয় নাই। তিনি যখন বলিয়াছেন, শ্রীভগবান অবশ্যই আসিবেন। তাঁহার বাক্য নিশ্চয়ই সফল হইবে।" গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আবার সে হৃদয় হইতে নৈরাশ্যের অন্ধকার অপসারিত করিল। তাহার হৃদয়ে আবার আশার স্নিগ্ধ আলোক জ্বলিয়া উঠিল। আশার সঞ্চারে তাহার মন-প্রাণ উৎফুল্ল হইল।

একদিন প্রাতে শবরী পুষ্প চয়ন করিতে যাইয়া দেখে আশ্রমোদ্যানের সকল ফুলই ফলে পরিণত হইয়াছে। শবরী গাছে একটিও ফুল পাইল না। তবে কি আজ তাহার ভক্তি-পুষ্প ফল-প্রসব করিবে? আজ কি তাহার আকুল প্রতীক্ষা সফল হইবে? শবরী উদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, আশ্রমে-বেদীতে লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গজ্যোতিতে দশ দিক দীপ্ত করিয়া বিরাজমান। তার বহু বর্ষের অর্ঘ্য রচনা সার্থক হইয়াছে। এতদিনে তাহার সাগ্রহ আহবান প্রভু শুনিয়াছেন। নবদূর্বাদল-কান্তি ভক্তমনোরঞ্জন সত্যব্রতধারী শ্রীরামচন্দ্র দর্শনে শবরী আনন্দে আত্মহারা! নয়ন মুদিয়া সে দেখিল, তাহার হৃদয়-বেদী আলোকিত করিয়াও শ্রীভগবান প্রকাশিত। আনন্দের আতিশয্যে শবরী নির্বাক্। শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-কমল-যুগল সে চোখের জলে ধুইয়া স্বীয় কেশে মুছিল। পরে সুগন্ধি পুষ্পে পাদ-পূজা করিয়া তাঁহাকে আহৃত ফল নিবেদন করিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ শবরী-

প্রদত্ত ফলাহারপূর্বক আশ্রম পরিদর্শনে উঠিলেন। শবরী অতিথিবরকে ফলপুষ্পশোভিত মৃগপক্ষি-সমাকুল মাতঙ্গ-বনের দর্শনীয় সকল বস্তু এবং বৃক্ষ ও পশু দেখাইল। সে বলিল, "গুরুদেবের যাবজ্জীবন তপঃপ্রভাবে হিংস্র জন্তু হিংসা ত্যাগ করিয়া আশ্রমে একত্র বাস করিতেছে। এই বনের পুষ্পরাজি যতদিন বৃক্ষে থাকে ততদিন মলিন গন্ধহীন হয় না। মহর্ষি যাগযজ্ঞ ও কঠোর তপস্যায় সমগ্র জীবন আপনার অপেক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আজ আশ্রম পবিত্র ও কৃতার্থ হইল। গুরুর আকাঙ্ক্ষা শিষ্যে পরিপূর্ণ হইল। আমার জীবনে দ্বিতীয় বাসনা নাই। আমি গুরুসমীপে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিব। তার পূর্বে আপনার সম্মুখে আমি অগ্নিতে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করি।" রামচন্দ্র স্বীয় প্রয়োজনেই শবরীকে দর্শন দিয়াছিলেন। সীতার অদর্শনে অতি অধীর হইয়া শবরীর নিকট সীতার অবস্থিতির সংবাদ জানিতে তিনি মাতঙ্গ আশ্রমে উপস্থিত হন। সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়া লঙ্কায় অশোকবনে আছেন। এই খবর রামচন্দ্র শবরীর মুখে শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া সীতা উদ্ধারের সঙ্কেত লাভে রামচন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া শবরীকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

চিতা প্রস্তুত। ঘৃতসংযুক্ত শুষ্ক কাষ্ঠ সংযোগে চিতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। চিতা সমীপে ভবসাগরের কাণ্ডারী সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান। শবরী আশ্রমস্থ সকল পুষ্পবৃক্ষ, ফলবৃক্ষ ও মৃগাদি জন্তুর নিকট বিদায় লইল। গুরুর বাক্য আজ সে পালন করিতে পারিবে—এই তৃপ্তি ও প্রসাদে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। ভগবদ্দর্শন নিমিত্ত তাহার মনও নির্ভীক। এইরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী অভীঃ একমাত্র ঈশ্বরদর্শনেরই ফল। মৃত্যুর পূর্বে যাহার নাম একবার মাত্র স্মরণ করিলে মানুষ সংসারের ত্রিতাপজ্বালা হইতে বিমুক্ত হয়, সেই ভগবান যখন মানব দেহে তাহার সম্মুখে উপস্থিত তাহার আর ভয় কি? শ্রীগুরুর স্মরণ এবং শ্রীভগবানের দর্শন করিতে করিতে শবরী ধীরপদে, শান্তমনে ও হাসিমুখে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিল। শবরীর সংশুদ্ধ শরীর পূতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। রঘুপতি আশ্রম হইতে অন্তর্হিত হইলেন। শবরীর মুক্তাত্মা ব্রহ্মলোকে গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া ব্রহ্মপদে বিলীন হইল। সূর্যের রশ্মি সূর্যেই পুনর্মিলিত হইল। সাগর-সলিল সাগরে ফিরিল।

দ্বিতীয় মণি

সান্তা ক্লারা

পাশ্চাত্ত্য সাধিকাগণের মধ্যে সান্তা ক্লারা অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাপসী। তিনি ছিলেন সেণ্ট ফ্রান্সিসের প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যা। ক্লারা যীশু খ্রীষ্টের সহচরী ও সখীরূপে পরিচিতা। কিন্তু তিনি নিজেকে পুণ্যস্মৃতি ফ্রান্সিসের ক্ষুদ্র শিষ্যারূপে পরিচয় দিতেন। পল সাবেটিয়ার সেণ্ট ফ্রান্সিসের যে প্রসিদ্ধ জীবনী লিখিয়াছেন তাহার নবম অধ্যায়টীর নাম সান্তা ক্লারা। এই অধ্যায়ে তাপসী ক্লারার পূত জীবনীর কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়। সেলানোর ফাদার টমাস প্রণীত ক্লারার বিস্তৃত জীবনীখানির একটি সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ ফাদার পাস্কাল রবিনসন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বাংলায় এই অমর সাধিকার কোন জীবনী নাই।

ক্লারা আসিসিতে ধনী নাইট বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেণ্ট ফ্রান্সিস অপেক্ষা দ্বাদশ বর্ষ কনিষ্ঠা। তিনি স্কিফির উচ্চকুলোদ্ভবা এবং ঐশ্বর্যের কোমল ক্রোড়ে পালিতা। শৈশব হইতেই তাঁহার মন অতিশয় শুদ্ধ ও মহৎ ছিল। আসিসি সহরে যে সকল দরিদ্র বাস করিত তিনি তাহাদিগকে গোপনে অন্ন-বস্ত্র ও অর্থাদি দান করিতেন। ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদনের জন্য তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র দেহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করিয়া গোপনে অনাথ বালকবালিকার ক্ষুধা নিবারণার্থ স্বীয় আহার্যঅংশ প্রেরণ করিতেন। বাল্য হইতেই ভোগবিলাস ত্যাগ ও কঠোরতা অভ্যাস তাঁহার স্বভাবগত ছিল। বিবাহযোগ্যা হইলে তিনি মাতাপিতার সনির্বন্ধ অনুরোধেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তখন হইতেই তিনি মীরাবাইয়ের মত ঈশ্বরকে স্বপতিরূপে বরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন।

ফ্রান্সিসের সম্মান ও সম্পদ পরিত্যাগ এবং সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া ক্লারা তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার উপদেশ শুনিতে আগ্রহান্বিতা হন। যখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর তখন সেণ্ট ফ্রান্সিস আসিসির গীর্জায় প্রথম উপদেশ দেন। পরম শান্তির দেবদূতরূপে আবির্ভূত হইয়া ফ্রান্সিস আসিসির অধিবাসিগণের নিকট শান্তির বাণী প্রচার করেন। ফ্রান্সিসের বাণী ক্লারার মর্ম স্পর্শ করিল।

তিনি ভাবিলেন, মহাতাপসের এই দেববাণী তাঁহার জনাই উদ্দিষ্ট। তিনি ফ্রান্সিসের পদানুসরণ করিবার জন্য স্থির সংকল্প করিলেন। সেণ্ট রুফিনোতে ফ্রান্সিসের উপদেশ শুনিয়া ক্লারার সংকল্প আরও দৃঢ় হইল। তিনি ফ্রান্সিসের মুখে শুনিলেন, 'তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অপূর্ব কাহিনী, কিরূপে যীশুখৃষ্ট ক্রুশ হইতে তাঁহার সহিত কথা বলিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পদানুসরণ করিতে আদেশ দিলেন।' ক্লারার হৃদয়ে আর সংশয়ের লেশমাত্র রহিল না। তিনি জীবনের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলেন। ইহার পর তিনি বহুবার ফ্রান্সিসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রত্যেক সাক্ষাতেই তাঁহার সরল হৃদয়ে গভীর প্রেরণা আসিল। তিনি ফ্রান্সিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে উৎসুক হইলেন। ত্যাগ ও সেবার জীবন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিল। যখন তিনি স্বীয় মনোভাব ফ্রান্সিসের নিকট ব্যক্ত করিলেন, তখন সন্ন্যাসীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। তিনি মহানন্দে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। ধনীসুতা ক্লারার বৈরাগ্য পরীক্ষার্থ ফ্রান্সিস তাহাকে মোটা মলিন কাপড় পরিয়া দরিদ্রের জন্য আসিসি সহরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে বলিলেন। ক্লারা বিনা দ্বিধায় ফ্রান্সিসের আদেশ পালনপূর্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন।

এখন ফ্রান্সিস ক্লারাকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিতা করিতে সম্মত হইলেন। কুসুমের মত হৃদয়েরও সৌরভ আছে। সেই সৌরভই হৃদয়ের পরিচয়। ফ্রান্সিসের অন্তর্দৃষ্টি ক্লারার পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় পাইল। তিনি আর ক্লারাকে অন্য কোন পরীক্ষায় ফেলিলেন না। তিনি ভাগবত ইঙ্গিতে এবং স্বহৃদয়ের নির্দেশে তাঁহাকে সন্ন্যাসীর ত্যাগময় জীবন গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে ক্লারা দুই সঙ্গিনীর সহিত গোপনে পৈতৃক প্রাসাদ পরিত্যাগপূর্বক কন্যার বেশে পর্টিয়াঙ্কুলাতে আসিলেন। তখন মঠের সন্ন্যাসিগণ উপাসনারত। ফ্রান্সিস তাহাকে সন্ন্যাস দানের জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্লারাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার জন্য সাধুগণ বাতি জ্বালিলেন। পর্টিয়াঙ্কুলার চতুষ্পার্শ্বস্থ বনের বৃক্ষরাজি তাঁহার আগমনে আনন্দ-সঙ্গীত গাহিল। যে বেদীতে তিন বৎসর পূর্বে ফ্রান্সিস সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন সেখানে সন্ন্যাসিগণ উপাসনামগ্ন হইলেন। গৃহত্যাগ ও দারিদ্র্যবরণ করিয়া ক্লারা যে বিপদ ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতেছেন তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। পরন্তু আত্মত্যাগের আনন্দে

তিনি উৎফুল্ল হইলেন। শিষ্যগণের প্রতি খ্রীষ্টের বাক্য ফ্রান্সিস কর্তৃক পঠিত হইল। ক্লারা খ্রীষ্টবাক্য জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য সাধুগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ফ্রান্সিস স্বহস্তে ক্লারার সুন্দর কেশদাম কাটিয়া ফেলিলেন। ক্লারার সংসার শেষ হইল। ক্লারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। এক ঘণ্টা পথের ব্যবধানে বেনিডিক্টিন সন্ন্যাসীগণের একটি মঠ ছিল। তথায় ফ্রান্সিস ক্লারাকে লইয়া রাখিয়া আসিলেন। এই মঠে তাঁহাকে আপাততঃ থাকতে হইল।

ঠিক পরদিন প্রাতে ক্লারার পিতা ফেভারিনো বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে মঠে আসিয়া সকলকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কন্যা-শোকে মুহ্যমান পিতা কখনো কন্যাকে, কখনো বা সন্ন্যাসীদের ভর্ৎসনা করেন, আবার পরক্ষণে তাহাদের অনুনয় করেন। পিতার অশ্রুদর্শনেও ক্লারা অবিচলিতা রহিলেন। তিনি এত মনের জোর দেখাইলেন যে, পিতা তাঁহাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। এখানেই ক্লারার ক্লেশ শেষ হইল না। আসিসি সহরের পান্‌সো নামক স্থানের সাল্টলো মঠে তাঁহাকে দুই সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল। ইষ্টারের এক সপ্তাহ পরে আগনেস নাম্নী তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী সন্ন্যাসিনী হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত মিলিতা হইলেন। তখন আগনেসের বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর। ফ্রান্সিস তাহাকেও সঙ্ঘে স্থান দিলেন। আগনেসের গৃহত্যাগে পিতার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। একদল আত্মীয়ের সহিত তিনি উক্ত সন্ন্যাসিনীমঠ আক্রমণ করিলেন। নিষ্ঠুর প্রহার বা ভর্ৎসনায়ও আগনেস দমিল না। তাহার করুণ ক্রন্দন সত্ত্বেও তাহারা তাহাকে নির্দয় ভাবে বন্ধুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। একটু পরেই বালিকা সংজ্ঞাহীন হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় এখানে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। অচেতন দেহ এত ভারী বোধ হইল যে, তাহারা তাহা বহন করিতে পারিল না। তাহারা দেহটি ক্ষেত্র মধ্যে ফেলিয়া গেল। ক্ষেত্রকর্মরত শ্রমিকগণের হৃদয় উক্ত হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শনে বিগলিত হইল। ক্লারার আন্তরিক প্রার্থনা ঈশ্বর শুনিলেন। আগনেসের প্রাণ ও ব্রত উভয়ই রক্ষা পাইল। ক্লারার আর এক সহোদরা এবং তাহার মাতা পিতা ফেভারিনোর মৃত্যুর পর ক্লারার মত সন্ন্যাসিনী হইলেন। মাতা কন্যার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন।

ক্লারা ও আগনেসের অবস্থান এই মঠে দীর্ঘ হয় নাই। তাঁহারা এখানে সুখে শান্তিতে ছিলেন না। অন্যান্য বালিকারা তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য ব্যগ্র

হইল। ফ্রান্সিস তাঁহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মঠ স্থাপনের ইচ্ছা করিলেন। এইজন্য তাঁহাকে বহু অন্বেষণ করিতে হয় নাই। সুবাসিও পাহাড়ের বেনিডিক্টিন সাধুরা সেণ্ট ডামিয়ান গীর্জাটি এই উদ্দেশ্যে দান করিলেন। মঠটি আসিসি সহরের বাহিরে অবস্থিত এবং উপাসনা ও ধ্যানের উপযোগী ছিল। এই স্থানে ফ্রান্সিস তাঁহার ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনী শিষ্যাগণকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই মঠের প্রার্থনালয়টি তিনি স্বহস্তে মেরামত করিলেন। এই প্রার্থনালয়ে যে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টমূর্তি ছিল তাহা ফ্রান্সিসের সহিত কথা বলিয়াছিল। উক্ত মূর্তির পদতলে বসিয়া এখন হইতে ক্লারা উপাসনা করিবেন। নূতন মঠে প্রবেশ করিবামাত্র ক্লারার হৃদয় নবভাবে উদ্দীপিত হইল। এই মঠেই ক্লারার সমগ্র সন্ন্যাসিনী জীবন, প্রায় চল্লিশ বৎসর, অতিবাহিত হয়। সান্তা ক্লারার পুণ্য স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া সেণ্ট ডামিয়ান অদ্যাপি পূর্বাবস্থায় বিদ্যমান।

ক্লারাকে উক্ত মঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফ্রান্সিস তাঁহার হস্তে স্বরচিত নিয়মাবলী দিলেন। ফ্রান্সিস এবং তাঁহার সন্ন্যাসী ভ্রাতাগণ ক্লারা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণের সকল অভাব শ্রম বা ভিক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিবার ব্রত লইলেন। তৎপরিবর্তে সন্ন্যাসিনীগণ তাঁহাদিগকে সাধ্যমত সেবা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গির্জার বেদীতে যে বস্ত্র ব্যবহৃত হইত সেগুলি প্রস্তুত করিবার জন্য ক্লারা সূতা কাটিতে লাগিলেন। ফ্রান্সিস যে সকল রোগী পাঠাইতেন ক্লারা তাহাদিগের সেবাশুশ্রূষাও করিতেন। সুতরাং কিছু কালের জন্য সেণ্ট ডামিয়ান একপ্রকার হাসপাতালে পরিণত হইল। ফ্রান্সিস এবং তাঁহার আরও দুই একটি সন্ন্যাসী ভ্রাতা সন্ন্যাসিনীগণের অশেষ যত্ন লইতেন। তাঁহারা সেণ্ট ডামিয়ানের পার্শ্বে কুটির নির্মাণপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সিসও অদূরে থাকিতেন। ক্লারা স্বীয় মঠ-প্রাঙ্গণে একটি ছোট পুষ্পোদ্যান করিলেন। যখন সন্ধ্যায় বা প্রাতে তিনি উক্ত উদ্যানে জলসেচন করিতে যাইতেন তখন অর্ধলীগ দূরে পশ্চিমাকাশের উজ্জ্বল আলোকে দণ্ডায়মান স্বীয় গুরুর আবাসস্থল পর্টিয়াঙ্কুলা মঠ দেখিতে পাইতেন।

কয়েক বৎসর উভয় মঠের মধ্যে প্রচুর প্রীতি ও সেবার সম্বন্ধ ছিল। ফ্রান্সিসের সঙ্গীগণ প্রচার-ভ্রমণ হইতে ফিরিবার সময় দুই একটি বালিকা সেণ্ট ডামিয়ানের জন্য আনিতেন। কিন্তু, ফ্রান্সিস ও ক্লারার ঘনিষ্ঠতা ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণের আদর্শস্থল হইতে পারে না। সেইজন্য উভয় মঠে নূতন নূতন

নিয়ম প্রবর্তিত হইল। ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর ক্লারা প্রায় সাতাইশ বছর জীবিতা ছিলেন। ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পূর্বে ও পরে তৎপ্রদর্শিত আদর্শ হইতে ক্লারা বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল এই পারিজাত পুষ্পটি রোমের পোপগণের রুদ্র রোষে শুষ্কপ্রায় হইয়াছিলেন। শেষে ক্লারারই জয় হইল। কার্ডিনাল উগোলিনি (যিনি পরে পোপ নবম গ্রেগরী হইয়াছিলেন) ফ্রান্সিস ও ক্লারাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু তাঁহার মত গুপ্ত শত্রু ফ্রান্সিস সঙ্ঘে আর কেহই ছিলেন না। ১২২৮ খ্রীঃ মে মাসে নবম গ্রেগরী সেণ্ট ফ্রান্সিসকে মৃত্যুর পরে সিদ্ধপুরুষের শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য আসিসিতে গমন করেন। সহরে প্রবেশ করিবার পূর্বে পথিমধ্যে তিনি সেণ্ট ডামিয়ান পরিদর্শন ও ক্লারার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গ্রেগরী পূর্ব হইতেই ক্লারাকে জানিতেন, কিন্তু দেখেন নাই। তিনি ক্লারাকে যে সকল পত্র লিখিতেন সেগুলি পিতৃস্নেহ ও প্রশংসায় পূর্ণ থাকিত। তিনি ক্লারাকে মঠ পরিচালনায় কিছু অর্থ ও সম্পত্তি দিতে চাহিলেন। তিনি ক্লারাকে বুঝাইলেন, কালের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে, কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসিনীর জীবন নিরাপদ নহে। এই অদ্ভুত প্রস্তাবে ক্লারা গ্রেগরীর দিকে বিস্মিত নয়নে তাকাইলেন। তখন গ্রেগরী বলিলেন, 'যদি তোমার ব্রতগুলি এই সম্পত্তি গ্রহণের পরিপন্থী হয়, তবে আমরা তোমাকে ব্রত-মুক্ত করিব।' তেজোদৃপ্তা সন্ন্যাসিনী বলিয়া উঠিলেন, 'পূজ্য পিতা! আমার দোষ ক্ষমা করুন। যীশু খ্রীষ্টের পদানুসরণ ব্যতীত অন্য কোন বিধান গ্রহণের বাসনা আমার নাই।' সন্ন্যাসিনীর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। ১২২৮ খ্রীঃ ১৬ই জুলাই গ্রেগরী ফ্রান্সিসকে সিদ্ধপুরুষের শ্রেণীভুক্ত করিবার অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিলেন। পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্টের নিকট সান্তা ক্লারা চির দারিদ্র্যের অনুমতি ভিক্ষা করেন। উক্ত অনুরোধে পোপ এতই চমৎকৃত হন যে, এই অনুমতির প্রথম বাক্যগুলি স্বহস্তে লিখিয়া দেন। কারণ, ইতিপূর্বে রোমের আদালতে এইরূপ বিধান আর প্রার্থিত হয় নাই। তৃতীয় ইনোসেণ্টের পরবর্তী পোপ ছিলেন তৃতীয় অনারিয়াস। ইঁহার অধীন ছিলেন কার্ডিনাল উগোলিনি। তখন উগোলিনি সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি নানাভাবে সেণ্ট ফ্রান্সিস ও সান্তা ক্লারাকে সাহায্য ও স্নেহ করিতেন। ক্লারাকে কঠোর দারিদ্র্যব্রত হইতে বিচ্যুত করিবার সকল চেষ্টা পোপের ব্যর্থ হইল। ফ্রান্সিসের আদর্শ আক্ষরিক ভাবে পালন করিবার জন্য ক্লারাপ্রমুখ সন্ন্যাসিনীগণ মৃত্যুপণ করিলেন। বোহেমিয়ার

রাজকুমারী প্রথমা অটোকার তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ক্লারার সহিত অটোকারের গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। অটোকার স্বয়ং নবম গ্রেগরীকে সনির্বন্ধ অনুরোধেও নমনীয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু, ক্লারাও অপরাজেয়া ছিলেন। একদিন তিনি পোপের আদেশ অমান্য করিলেন। শেষে পোপই ক্লারার দারিদ্র্য-ব্রত অনুমোদন করিতে বাধ্য হইলেন। সেণ্ট ফ্রান্সিসের সন্ন্যাসিনীগণের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করাই ছিল গ্রেগরীর গুপ্ত অভিসন্ধি। ক্লারার ত্যাগ এবং তপস্যার প্রভাবে গ্রেগরীর অসদভিপ্রায় সফল হয় নাই। ক্লারা এই প্রতিবেশী সন্ন্যাসীগণকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং প্রায়ই একজন সন্ন্যাসীকে আনাইয়া মঠে প্রচার করাইতেন। পোপের দৃষ্টিতে উক্ত সম্বন্ধ ভাল লাগিল না। তিনি আদেশ দিলেন যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত পটিয়াঙ্কুলার কোন সন্ন্যাসী সেণ্ট ডামিয়ানে যাইতে পারিবেন না।

সান্তা ক্লারা এইবারে ক্রোধান্বিতা হইলেন। তাঁহার মঠের পার্শ্বে যে কয়েকজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন তিনি তাঁহাদের নিকট গেলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আপনারা এখান থেকে চলে যান। যাঁহারা আমাদের আধ্যাত্মিক আহার দান করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ হইতে যখন আমরা বঞ্চিত হইলাম, তখন আমাদের যাঁরা স্থূল আহার প্রদান করেন, তাঁহাদেরও আমরা চাই না।' পোপ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। সেণ্ট ডামিয়ান ফ্রান্সিসের ভক্তিবিগলিত কণ্ঠস্বরে প্রায়ই মুখরিত হইত। তিনি প্রায়ই তাঁহার প্রধান শিষ্যা ক্লারার সহিত ধর্মপ্রসঙ্গে মাতিয়া যাইতেন। একদিন মঠপ্রাঙ্গণে ফ্রান্সিস ক্লারার সহিত ভোজন করিতেছিলেন। আহারকালে ফ্রান্সিস ভগবৎভাবে এত বিভোর হইয়া গেলেন যে, দিব্য উন্মাদনায় তিনি আবিষ্ট হইলেন। দিব্যাগ্নির স্ফুলিঙ্গ তাঁহার বাক্য হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য ইতিমধ্যেই বিশাল জনসমাগম হইয়াছিল। সমবেত জনমণ্ডলী আকাশে দিব্যাগ্নির আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

সেণ্ট ফ্রান্সিসের এগিডিও, লিও, এঞ্জেলো, জিনেপ্রো প্রভৃতি আদি অনুচরগণ নিয়মিতভাবে সেণ্ট ডামিয়ানে যাতায়াত করিতেন। এই খাঁটি দারিদ্র্যব্রতীগণ উক্ত মঠে যে স্বাধীনতা অনুভব করিতেন তাহা অন্যত্র অসম্ভব ছিল। একদিন এক ইংরাজ সন্ন্যাসী প্রচারার্থ সেণ্ট ডামিয়ানে আসিলেন। মিনিষ্টারের আদেশেই উক্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তথায় আগমন করেন। তিনি যখন মঠে প্রচার করিতেছিলেন তখন হঠাৎ

সরলহৃদয় এগিডিও তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'থাম ভাই, আমাকে বলতে দাও।' এগিডিওর আজ্ঞা পালন করিয়া পণ্ডিতপ্রবর আসন গ্রহণ করিলেন। তখন এগিডিও আবেগভরে খ্রীষ্টবাণী ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার বাণীর পশ্চাতে সাধনা ও অনুভূতি ছিল বলিয়া উহা সকলের চিত্ত উদ্বুদ্ধ করিল। ক্লারা ইহাতে পরমানন্দিতা হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তিনি যেন এখন সেণ্ট ফ্রান্সিসের সময়ে বাস করিতেছেন! ঘটনাটি ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পরে ঘটে। ক্লারার মৃত্যু পর্যন্ত উভয় মঠের মধ্যে এই সম্বন্ধ ও স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। লিও, এঞ্জেলো এবং জিনেপ্রো নামক সন্ন্যাসীত্রয়ের সমক্ষেই ক্লারা দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার অলৌকিক অনুভূতি হইয়াছিল। মৃত্যুকালে ক্লারার বয়স প্রায় ষাট বৎসর ছিল।

সেণ্ট ফ্রান্সিস যখন দুঃখদৈন্যে পতিত হইতেন, তাঁহাকে উৎসাহিত ও আশ্বাসিত করিতেন তাঁহার প্রধানা শিষ্যা সান্তা ক্লারা। ক্লারার উৎসাহে তিনি প্রচারার্থ নানা স্থানে গমন করেন এবং সঙ্গীদেরও প্রেরণ করেন। সেণ্ট ডামিয়ানে ফ্রান্সিস পূর্ণ শান্তি ও সুস্থতা অনুভব করিতেন। উক্ত মঠপ্রাঙ্গণের অলিভ গাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া যে সূর্যসঙ্গীত তিনি রচনা করেন তাহা আর্ণেষ্ট রেনানের মতে আধুনিক ধর্মসাহিত্যের এক উৎকৃষ্টতম রচনা। ক্লারার শিষ্যাগণ এক নূতন সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। উহা ইটালীতে এখনও প্রতিষ্ঠাশীল। ক্লারার জীবিতকালেই এই সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ ইটালীর সর্বত্র এবং স্পেন, ফ্রান্স ও জার্মেনীতে বিস্তৃত হয়। উক্ত মঠের সন্ন্যাসিনীগণ ক্লারিসা নামে অভিহিতা এবং সমগ্র ইউরোপে সম্মানিতা।

তৃতীয় মণি

মীরাবাই

মধ্য যুগে ভারতীয় ধর্মে ভক্তিবাদের অভ্যুদয় হয়। দ্বাদশ শতকে রামানুজাচার্য এই ভক্তি-ধর্ম দক্ষিণ ভারতে প্রচার করেন। বৈষ্ণবাচার্য রামানন্দ কর্তৃক এই ভক্তি-গঙ্গা দক্ষিণ দেশ হইতে উত্তর ভারতে প্রবাহিত হয়। তাঁহার শিষ্য রয়িদাস ছিলেন চিতোরের মীরাবাই ও ঝালি নামক রাণীদ্বয়ের ধর্ম-গুরু। সাধু রয়িদাসের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শিখদিগের ধর্মশাস্ত্র 'আদি গ্রন্থসাহেবে' রয়িদাসের ত্রিশটী ভজন পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুর প্রসঙ্গে মীরাবাই বলিতেছেন—

খড়ি খড়ি রে পন্থ নেহারু, মরম ন কোই জানা।
সদ্‌গুরু য়্যাসা ঔষধ দীনী, রোম রোম ভয়ো চইনা॥
নহি মে পিহর শাশর রে, নহি পিয়াজীরে পাস।
মীরা নে গোবিন্দ মিলিয়া রে, গুরু মিলিয়া রয়িদাস॥

অনুবাদ—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমি পথের সন্ধান করিয়াছি। কেহ আমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে নাই। সদ্‌গুরু রয়িদাস আমাকে ভবরোগের এমন ঔষধ (দীক্ষামন্ত্র) দিলেন যাহা শ্রবণমাত্র আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইল। আমি পিতা, শ্বশুর বা পতির নিকট থাকি না। প্রিয়তম গোবিন্দের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন গুরু রয়িদাস। আমি প্রিয়তমের সঙ্গেই থাকি।

মীরাবাই ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাধিকা। তিনি ১৫০০ খ্রীঃ মাড়োয়ারের কুরখী গ্রামে রাজা রতন সিংহের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ ভক্তিমতী ও রূপবতী ছিলেন। যখন তিনি পাঁচ বৎসরের বালিকামাত্র, তখন একদিন তাঁহার পিতার রাজপ্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া একটী বিবাহের শোভাযাত্রা যাইতেছিল। মাতা কৌতূহলবশতঃ স্বীয় কন্যা মীরাকে যাত্রিদল-মধ্যস্থ বরটী দেখাইয়া দিলে মীরা শিশুসুলভ সরলভাবে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বর কে, মা? মাতা সহাস্য বদনে মন্দির-মধ্যস্থ গিরিধারী গোপাল-মূর্তিকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'ইনিই তোমার বর।' শিশুকাল হইতেই এই মূর্তি মীরার পরম

প্রিয় ছিল। এই মূর্তির সহিত খেলা করা ও কথা বলা এবং ইহাকে স্নান করান, সাজান ও পূজা করা প্রভৃতি কাজে বালিকা মীরার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত।

প্রায় বার তের বৎসর বয়সে মীরার সহিত চিতোরের যুবরাজ ভোজের বিবাহ হয়। প্রায় তেইশ বৎসর বয়সে মীরার মানব-পতির মৃত্যু ঘটে। কিন্তু গিরিধারী ছিলেন মীরার প্রকৃত পতি। মীরা আজীবন তাঁহার ধ্যান-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। গৃহকর্ম ও মানব-পতির সেবাশুশ্রূষান্তে তিনি দেব-পতির অনুধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন। রাজা ভোজের ভগ্নী রাজকুমারী উদা মীরাকে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চিতোর প্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা মাতার আরাধনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু, অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁহার মাতার (মীরার শাশুড়ীর) সহায়ে মীরার বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটাইয়া দেন। রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ চিতোরের রাণা সংগ ছিলেন রাজা ভোজের পিতা। রাণা সংগ মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া রাজপুতানার জংগলে ও মরুভূমিতে ক্ষুৎপিপাসার্ত সন্তানাদির সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভগ্নী উদা এবং রাজপরিবারস্থ অন্যান্যের মুখে যখন রাজা ভোজ (এই মিথ্যা সংবাদ) শুনিলেন যে, তাঁহার রাণী মীরা গভীর রাত্রিতে মন্দির মধ্যে অন্য পুরুষের সহিত প্রেমালাপ করেন, তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তরবারি হস্তে মীরাকে হত্যা করিবার জন্য ছুটিলেন। পথে জনৈকা বর্ষীয়সী মহিলার অনুরোধে নিরস্ত হইয়া এই বিষয়ে সত্যতা নিরূপণের জন্য রাত্রির অপেক্ষায় রহিলেন। পূর্ববৎ মীরা গৃহকর্ম সমাপনান্তে গভীর যামিনীতে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ-প্রিয় পতি গিরিধারীর চরণে আত্মনিবেদনে সমাহিতা হইলেন। রাজা ভোজ ভীষণ শব্দে দ্বার ভগ্ন করিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, মীরা প্রেমভাবে বিভোর, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। দ্বার ভঙ্গের বিপুল ধ্বনিতেও মীরার ধ্যান ভংগ হইল না। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনে রাজা ভোজ, তাঁহার মাতা ও ভগ্নী এবং রাজ অন্তঃপুরের মহিলাগণের ভুল ভাঙিগল। তাঁহাদের মর্মন্তুদ অনুশোচনা আসিল। রাজা ভোজ একটী পৃথক্ নূতন মন্দির মীরার জন্য নির্মাণ করাইয়া মীরাকে স্বীয় সাধনভজন লইয়া থাকিবার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে সাধিকার স্বাধীনতা ও সাধনে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন।

মানব-পতিকে অস্বীকার না করিলেও তাঁহার দেব-পতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মীরার হৃদয়ভরা অনুরাগ ছিল। রাত্রিতে যখন সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ ও সুষুপ্ত হইত তখন

মীরা জাগ্রতা থাকিয়া স্বরচিত ভজন গাইয়া সমস্ত রজনী কাটাইতেন। একদিন তিনি গাহিতেছিলেন—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুস্‌রা ন কোই।
মাতা ছোড়ী, পিতা ছোড়ে, ছোড়ে সগা সোই॥
সাধু সংগ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই।
সন্ত দেখ দৌড়ি আই জগত দেখ রোই।
প্রেম আঁসু ডার ডার অমর বেল বোই॥
মারগমে তারণ মিলে সন্ত নাম দুই।
সন্ত সদা শীষপর নাম হৃদে হোই॥
অবতো বাত ফৈল গই, জানৈ সব কোই।
দাসী মীরা লাল গিরিধর হোনী স হোই॥"

অনুবাদ—গিরিধর গোপালই আমার পতি, অন্য কেহ নহে। আমি মাতা, পিতা, বন্ধু ও সংগী সমস্ত ত্যাগ করিয়াছি। সাধুদের সঙ্গে বসিয়া আমি লোক-লজ্জাও ছাড়িয়াছি। সাধুদর্শনে আমি দৌড়িয়া আসিতাম, কিন্তু সংসারী দেখিলে কাঁদিতাম। প্রেমাশ্রু সেচন করিয়া আমি অমর প্রেম-তরু সৃষ্টি ও সমৃদ্ধি করিয়াছি। অন্বেষণের ফলে সাধু (গুরু) ও তৎপ্রদত্ত নাম (মন্ত্র) পাইয়াছি। গুরু শিরোপরি আছেন, আর ঈশ্বরের নাম হৃদয়ে সদা ধ্বনিত হইতেছে। দাসী মীরা গিরিধর লালের চরণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। লোকে কি বলে তাহাতে মীরার কিছু যায় আসে না।

মীরা ছিলেন কবীর, নানক ও তুলসীদাস প্রমুখ মধ্যযুগীয় মহাপুরুষগণের সমসাময়িক। রয়িদাসের নিকট মীরা মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। গুরু লাভের পর তাঁহার ব্যাকুল চিত্তে বিরহাগ্নি নির্বাপিত হইয়া পরম শান্তির অফুরন্ত ফোয়ারা খুলিয়া যায়।

সাধন-ভজনের সুবিধা ও স্বাধীনতা পাইয়া মীরা নবনির্মিত মন্দিরে তাঁহার পরমপ্রিয় গিরিধারীর উপাসনায় আত্মহারা হইলেন। তাঁহার অপূর্ব ভজন ও অসাধারণ ভগবদ্ভক্তির সংবাদ চারি দিকে প্রচারিত হইল। দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট আকবর ও তাঁহার বিখ্যাত গায়ক তানসেন মীরার সুমিষ্ট ভজন শ্রবণাগ্রহে ছদ্মবেশে চিতোরে মীরার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মেবারের রাণা ও দিল্লীর মোগল সম্রাটের মধ্যে তখন ভীষণ বিরোধ চলিতেছিল। সাধারণ বেশে আসিলে সম্রাটকে প্রাণ হারাইতে

হইবে। তাই আকবর ও তানসেন ছদ্মবেশে আসিলেন। আকবরের মাতা ছিলেন হিন্দু রমণী এবং আকবর নিজেও মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ বহু হিন্দু সাধুর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাই হিন্দু সাধুর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ছদ্মবেশী আকবর ও তানসেনের অনুরোধে মীরা ভজন গাহিলেন—

প্যারে দরশন দিজ্যো আয়, তুম্ বিন্ রহো ন যায়।
জল বিন কমল চন্দ বিন রজনী, ঐ সে তুম্ দেখ্যা বিন সজনী।
আকুল ব্যাকুল ফিরু রৈন দিন, বিরহো কলিজো খায়॥
দিবস ন ভূখ নীদ নহি রৈনা, মুখসে কথন ন আবৈ বৈনা।
কহা কহু কছু কহত ন আবৈ, মিলকর তপত বুঝায়॥
ক্যোঁ তরসাবো অন্তরযামী, আও মিলো কিরপা কর স্বামী।
মীরা দাসী জনম জনম কী, পড়ি তুম্হারে পায়॥

অনুবাদ—হে প্রিয়! আইস, দর্শন দাও। তোমার বিরহে আর থাকা যায় না। জল ব্যতীত কমল এবং চন্দ্র ব্যতীত রাত্রি যেমন হে বন্ধু! তোমা ব্যতীত আমিও তদ্রূপ। আকুল ব্যাকুল হইয়া রাতদিন ফিরিতেছি, বিরহ-জ্বালা কলিজা ক্ষয় করিতেছে। দিবসে আমার ক্ষুধা নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, আর মুখে কথা আসিতেছে না। কাহাকেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করে না। হে প্রিয়, মিলন দিয়া আমার হৃদয়ের তাপ জুড়াও। হে অন্তর্যামী, আর কেন কষ্ট দাও? হে স্বামিন্! কৃপা করিয়া আমার সাথে মিলিত হও। মীরা জন্মে জন্মে তোমার দাসী ও চরণে আশ্রিতা।

মীরার দিব্যভাবপূর্ণ সংগীত আকবরের হৃদয় দ্রবীভূত করিল। তিনি সম্রাটের অভিমান ত্যাগ করিয়া মীরার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার বহুমূল্য মুক্তাহার গিরিধারীর চরণে সমর্পণ করিলেন। মীরা প্রথমে উক্ত উপহার গ্রহণে স্বীকৃতা হন নাই; কিন্তু পরে যখন সম্রাট তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ইহা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় গিরিধারীর শ্রীচরণের শোভা বর্ধন করিবে তখন তিনি সম্মত হইলেন।

পর দিবস মন্দিরে মুক্তার হার দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন, গতদিনের ছদ্মবেশী আগন্তুক আকবর ব্যতীত আর কেহ নহেন। উক্ত সংবাদ রাজা ভোজের কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া মীরাকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্বক বলিলেন, 'তোমার অঙ্গ জনৈক মুসলমান স্পর্শ করিয়াছে। আমি আর তোমার মুখ দর্শন

করিব না। তুমি নদীর জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন কর।' পতিভক্ত মীরা স্বামীর তিরস্কারে ব্যথিতা ও ক্ষুণ্ণা না হইয়া সানন্দে পতির আদেশ পালনে নদীর দিকে চলিলেন। দেহের পতন হইলেই ত গিরিধারীলালের সহিত মিলিত হইবেন এবং তাঁহার বিরহ-ব্যথার অবসান হইবে। এই ভাবিয়া নদীর অভিমুখে চলিতে চলিতে পথে মীরা গান ধরিলেন।—

তুম্‌হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা, অব মোহি ক্যোঁ তরসাবোঁ হোঁ।
বিরহ-ব্যথা লাগী উর অন্তর, সো তুম আয় বুঝাবোঁ হোঁ॥

অনুবাদ—হে প্রিয়! তোমার জন্য সব সুখ ছাড়িয়াছি। এখন আমায় আর কেন কষ্ট দাও? বিরহ-ব্যথায় আমার হৃদয় প্রপীড়িত। তুমি আসিয়া হৃদয়ের সেই ব্যথা দূর কর।

মীরা স্রোতস্বিনীর সমীপবর্তিনী হইয়া নদী-গর্ভে প্রাণত্যাগের জন্য উদ্যতা। এমন সময়ে গিরিধারীলাল পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, 'আজ হইতে তুমি মানব পতির সম্পর্ক পরিত্যাগ কর। ডুবিয়া মরিবে কি দুঃখে? চল, একত্রে বৃন্দাবনে যাই এবং তথায় আনন্দে বাস করি।' এই বলিয়া গিরিধারী অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার অমৃতস্পর্শে মীরার মুমূর্ষু হৃদয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হইল। তিনি বৃন্দাবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথ ও পথিপার্শ্বস্থ কোন কিছুর দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই, সদা প্রিয়তমের চিন্তায় অন্তর্মুখ ও প্রেম-বিহ্বল। মীরা বৃন্দাবনের পথে উন্মাদিনীর মত যাইতে যাইতে গান ধরিলেন।—

মৈঁনে চাকর রাখোজী।
চাকর রাখো, চাকর রাখো, চাকর রাখোজী।
চাকর রহসুঁ বাগ বনাসু, নিতি উঠি দরসন পাঁসু।
বৃন্দাবনকী কুঞ্জগলিন্ মে তেরী লীলা গাঁসু॥
হরে হরে সব বাগ বনাঁউ বিচ বিচ রাখিয়ুঁ বারী।
শ্যামলিয়াকে দরসন পাঁউ পহির কুসুমমে সারী॥
জোগী আয়া জোগ করনকে তপ করনে সন্ন্যাসী।
হরী ভজনকে সাধু আয়ে বৃন্দাবনকে বাসী॥
মীরা কে প্রভু গহির গম্ভীরা হৃদয় রহোজী ধীরা।
আধি রাত প্রভু দরসন দেই হ্যায় প্রেমনদীকা তীরা॥

অনুবাদ—হে প্রভু, আমায় তোমার দাসী রাখ। তোমার ফুল বাগানের চাকর থাকিব এবং তোমার জন্য ফুলের মালা গাঁথিব। রোজ সকালে তোমার দর্শন পাইব। বৃন্দাবনের কুঞ্জপথে তোমার গান করিব। ফুলের বাগান রচনা করিব এবং তন্মধ্যে কুঞ্জ রাখিব। শ্যামল উদ্যানে কুসুমিত পরিধান পরে শ্যামের দেখা পাইব। বৃন্দাবনে যোগী আসিলেন যোগ করিতে, সন্ন্যাসী আসিলেন তপ করিতে এবং সাধু আসিলেন ভজন করিতে। মীরার সহিত প্রভুর গভীর প্রেম। রে হৃদয়! ধীর হও। প্রভুর সাক্ষাৎ তুমি পাইবে গভীর রাত্রে প্রেমনদীর তীরে।

অতঃপর প্রেমতীর্থ বৃন্দাবনে আসিয়া মীরা গোপী-প্রেমের সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। গভীর রাত্রিতে যখন জগৎ মোহনিদ্রায় অভিভূত তখন মীরা তাঁহার গিরিধারী নাগরের সম্মুখে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেন, আর গাহিতেন—'আঁখিতে রহো গো নন্দদুলাল।' বৃন্দাবনে তখন প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামী বাস করিতেন। ত্যাগ, তপস্যা ও পাণ্ডিত্যের গুণে তিনি তখন সমগ্র বৃন্দাবনে সুপরিচিত ও শ্রদ্ধাস্পদ। তিনি নারীমুখ দর্শন করিতেন না। মীরা এই বৈষ্ণব তাপসের দর্শন প্রার্থনা করিলেন। শ্রীরূপ মীরার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। মীরা তাঁহাকে পত্রে জানাইলেন, "ঠাকুর, এখনও আপনি স্ত্রী-পুরুষের ভেদ করেন? বৃন্দাবনধামে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আর সকলে প্রকৃতি। আপনি যদি গোপীভাবে সাধন না করিয়া নিজেকে পুরুষ ভাবেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে আপনার থাকা উচিত নহে।" শ্রীরূপ মীরার পত্রপাঠে স্বীয় সংকীর্ণতা বুঝিলেন এবং মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার বৃন্দাবনের উপস্থিতির সংবাদ চিতোরে আসিলে মেবার এবং অন্যান্য স্থানের ভক্তগণ তাঁহার প্রেম-ঘন-তনু দর্শন এবং তাঁহার প্রাণমাতান ভজন শ্রবণ মানসে বৃন্দাবনে ছুটিলেন। এই সংবাদে রাজা ভোজ অনুতপ্ত হইয়া মীরাকে রাজপ্রাসাদে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সন্ন্যাসীবেশে বৃন্দাবনে মীরার নিকট উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে সাদর অভ্যর্থনা করা হইলে তিনি মীরার কাছে ভিক্ষা চাহিলেন। মীরা তাঁহার স্বভাব-সুলভ মধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'আমি নিজেই ভিক্ষুক। আপনাকে আমি কি ভিক্ষা দিতে পারি?' সন্ন্যাসী কর্তৃক অতিশয় অনুরুদ্ধা হইয়া মীরা ঈপ্সিত ভিক্ষাদানে সম্মতা হইলে রাজা ভোজ স্বীয় ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া মীরাকে চিতোরপ্রাসাদে প্রত্যাগমনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। মীরা স্বামীর অপ্রত্যাশিত দর্শনে পরম প্রীতা

হইয়া ভোজের পদতলে পতিতা হইয়া চিতোরে যাইতে রাজী হইলেন। চিতোরে ফিরিয়া কিছুকাল বাস করিবার পরই তাঁহার পতি-বিয়োগ ঘটে। তখন মীরার বয়স মাত্র তেইশ বৎসর। ভোজের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা রতনসিং চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাণা রতনসিং মীরাকে ভীষণ নির্যাতিত করিয়াছিলেন। তিনি নানাভাবে মীরার জীবননাশের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার কি অনিষ্ট করিতে পারে? মীরা সকল অগ্নি পরীক্ষায় অত্যাশ্চর্যভাবে উত্তীর্ণা হইলেন। তাঁহার ভাষায় রাণার নির্যাতন ও প্রাণনাশের চেষ্টা নিম্নে বর্ণিত হইল।—

সাঁপ পিটারো রাণা ভেজ্যো, মীরা হাত দিয়ো জায়।
ন্হায় ধ্যোয় জব দেখন লাগী, সালগরাম গই পায়॥

অনুবাদ—রাণা সাপের ঝুড়ি (পেটরা) আমাকে দিয়াছিলেন। মীরা স্নান-ধ্যানান্তে উহাতে হাত দিয়া দেখিলেন, সাপের পরিবর্তে শালগ্রাম (বিষ্ণুমূর্তি)!

রাণার নির্যাতনে যখন মীরা একান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার পক্ষে রাজপ্রাসাদে অবস্থান অসম্ভব হইল তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ভক্তবর তুলসীদাসের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিত পত্র লেখেন।—

ঘরকে স্বজন হমারে জেতে, সবন উপাধি বড়াই।
সাধুসংগ অরু ভজন করত মোহি, দেত কলেশ অঘাই॥
বালপনেসে মীরা কীনী, গিরিধরলাল মিতাই।
সো তো অব ছুটৈ নহি ক্যোহঁ, লগন বরিয়াই॥

অনুবাদ—আমার গৃহের স্বজনগণ আমার সাধুসংগে বাধা এবং আমার সাধন-ভজনে ক্লেশ দিতেছে। বাল্যকাল হইতেই গিরিধর লালের সঙ্গে আমার মিত্রতা হইয়াছে। তাঁহার সহিত আমার প্রেমবন্ধন এত সুদৃঢ় হইয়াছে যে, এখন আর উহা ছিন্ন করা যায় না।

তুলসীদাস মীরার এই পত্রের উত্তরে নিম্নলিখিত জবাব দেন। একটী হিন্দী ভজনে জবাব লিখিত। মূল ভজনটী এখানে দেওয়া হইল।

যাকে প্রিয় ন রাম বৈদেহী।
ত্যজিয়ে তাহি কোটী বৈরী সম যদ্যপি পরম সনেহি॥

ত্যজো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, বরত মহতারী।
বলি গুরু ত্যজ্যো, কান্ত ব্রজবণিতনি, ভয়ে মুদমঙ্গলকারী॥
নাতে নেহ রামসোঁ মনীয়ত সুহৃদ সুসেব্য জহাঁ লোঁ।
অংজন কহা আঁখি জেহি ফুটৈ বহুতক কহোঁ কহাঁ লোঁ॥
তুলসী সো সব ভাঁতি পরম হিত পূজ্য প্রাণতে প্যারো।
জাতে হোয় সনেহ রামপদ এতো মতো হমারো॥

অনুবাদ—রাম ও বৈদেহী (সীতা) যাঁহাদের প্রিয় নহেন, তাঁহারা পরম স্নেহময় হইলেও তাঁহাদিগকে কোটী বৈরীর মত ত্যাগ করিবে। ঈশ্বরের জন্য প্রহ্লাদ পিতাকে, বিভীষণ ভ্রাতাকে, ভরত মাতাকে, বলি গুরুকে এবং ব্রজবণিতাগণ স্বামীগণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আচরণ নিজেদের ও জগতের মঙ্গলকর হইয়াছে। একমাত্র ঈশ্বরের সম্পর্কেই আত্মীয়-স্বজনগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। যে অঞ্জন বা চশমায় দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয় তাহা পরিয়া লাভ কি? আমার ইঙ্গিত বুঝিয়া লও। গিরিধারীই তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও পূজ্যতম। যাহাতে তাঁহার চরণে ভক্তি হয় তাহাই করিবে। ইহাই আমার মত।

তুলসীদাসের পত্রের মর্ম বুঝিয়া মীরা সংসার ত্যাগের সংকল্প করিলেন। একদিন শুভ মুহূর্তে রাজকুমারী রাণী মীরা প্রাসাদের সুখ চিরতরে বর্জন করিয়া গিরিধারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরপূর্বক পথের ভিখারিণী, সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। মীরার শেষ জীবন বৃন্দাবনধামেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বৃন্দাবনে সন্ন্যাসিনী-জীবনের দুঃখকষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিয়া দিবারাত্র কি করিয়া তাঁহার প্রিয়তমের ভজনারাধনায় কাটাইতেন মীরার নিম্নোক্ত সঙ্গীত হইতে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

হেরী মৈঁতো প্রেমদিবানী, মেরো দরদ ন জানৈ কোর।
সুলী উপর সেজ হামারী, কিস্ বিধ্ সোণা হোয়॥
গগন-মণ্ডল পর সেজ পিয়াকী কিস্ বিধ্ মিল্না হোয়।
ঘায়লকী গত ঘায়ল জানৈ, কীজিন্ লাগী হোয়।
জোহরীগত জোহরী জানে, কীজিন্ জোহরী হোয় ॥
দরকী মারী বন বন ডোলুঁ, বৈদ মিল্যো নাহি কোয়॥

মীরাকী প্রভু পীড় মিটৈ জব, বৈদ সাঁবলিয়া হোয়।
মৈং বিরহি ন বৈবী জাঁগ্, জগর সব সোয়ে রী আলী॥
বিরহি ন বৈবী রংমহলমে, মোতিয়ন কীলড় পোয়ে।
এক বিরহি ন হম ঐসী দেখী, অসুবন মালা পোয়ে॥
তারা গিন গিন রৈন বিহানী, সুখকী ঘড়ী কব আওয়ে।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, মিলকে বিছুড় ন জাওয়ে॥

অনুবাদ—সখি আমি প্রেমে পাগল, আমার ব্যথা কেহ জানে না। আমার শয্যা শূলের উপর, তাহাতে কিরূপে শোয়া যায়? আর আমার প্রিয়ের শয্যা গগনমণ্ডলে। সুতরাং তাঁহার সংগে কিরূপে মিলন সম্ভব? আহত ব্যক্তিই ঠিক্ ঠিক্ অন্য আহতের কষ্ট বুঝিতে পারে। জহুরীই জানে কিরূপে জহুরী হইতে হয়। প্রাণের ব্যথায় অস্থির হইয়া আমি বনে বনে ঘুরিতেছি। কিন্তু এই ব্যথার বৈদ্য পাই নাই। গিরিধর লাল যদি বৈদ্যরূপে উপস্থিত হন তাহা হইলেই মীরার এই ব্যথার অন্ত হইবে। হে সখা, এখন সমগ্র জগত নিদ্রিত, একমাত্র বিরহিণী মীরাই জাগ্রতা। আর এক বিরহিণী আছেন যিনি রংগমহলে জাগিয়া মুক্তার মালা গাঁথিতেছেন। কিন্তু, বিরহিণী মীরা বসিয়া বিরহাশ্রুর মালা গাঁথিতেছে। আকাশের তারা গুণিয়া গুণিয়া আমি সমস্ত রাত্রি কাটাই প্রিয়-মিলনের অপেক্ষায়। গিরিধর নাগরই মীরার প্রভু। প্রভুর দর্শনেই মীরার সব দুঃখ অবসান হইবে।

বৃন্দাবনে মীরা শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপিকাগণের মত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তন্ময় থাকিতেন। দিবারাত্রির পার্থক্য তাঁহার নিকট অন্তর্হিত হইয়া ছিল। তাঁহার নয়ন-যুগল গিরিধর লালের দর্শনেই নিযুক্ত থাকিত। প্রেমবিহ্বলা ও নৃত্যরতা মীরার মধ্যে ভক্তগণ অনেক সময় গিরিধর লালকেই দেখিতেন। মীরার হৃদয়-মন তাঁহার প্রিয়তমের অন্তরে চিরতরে নিমজ্জিত হইয়াছিল। এই অবস্থাকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে মহাভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মীরা প্রতি লোমকূপে সমস্ত বৃশ্চিক-সর্পাদির দংশন-জ্বালা অনুভব করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-মিলনে তিনি প্রতি লোমকূপে সংসারের সমস্ত সুখ উপভোগ করিতেন। এই অবস্থায় দেহ বেশী দিন থাকে না। মীরারও তাহাই হইল। তিনি গিরিধর লালের জন্য আকুল হইলেন। মহামিলনের শুভ দিবস সমাগত হইল। মীরার আর আনন্দের সীমা নাই। গৃহ-যাত্রী প্রবাসীর ন্যায় মীরাবাই সংসার-বিদেশ হইতে স্বদেশে যাইবেন। তাঁহার অংগ-প্রত্যংগে পরমানন্দের

লইলেন। নির্জনে নীরবে মীরা সশরীরে গিরিধরের মূর্তিতে মিলিতা হইলেন। পরদিন প্রাতে দেখা গেল, মীরার ওড়নাখানি দ্বারা গিরিধরের মূর্তি আবৃত! সমুদ্রের জল সমুদ্রে মিশ্রিত হইল।

নিরন্তর সপ্রেম সাধনার জ্বলন্ত মূর্তি ছিলেন মীরাবাই। তিনি কান্তভাবে কৃষ্ণভজন করিতেন। ইহা তাঁহার উল্লিখিত ভজনাবলী হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়।

মীরার এই ভজনটীতে সাধনরহস্য সুব্যক্ত।—

সাধন করনা চাহিয়ে মনুয়া, ভজন করনা চাহিয়ে।
প্রেম লগানা চাহিয়ে মনুয়া, প্রীত করনা চাহিয়ে॥
নিত নহানসে হরি মিলে তো, জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো, বাঁদুড় বাঁদরাই॥
তুলসী পূজনসে হরি মিলে তো, বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়নসে হরি মিলে তো, বহুত রহে হ্যায় খোজা॥
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো, বহুত বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা॥

অনুবাদ—সাধনা ও প্রেম থাকিলেই ঈশ্বর সুলভ। নিত্য স্নানে যদি হরি মিলিত তবে জলজন্তুগণ তাহাকে পাইত। ফলমূলাহারে যদি হরি মিলিত তাহা হইলে বাঁদর ও বাদুড়ই প্রকৃত ভক্ত হইত। তুলসী বৃক্ষ ও প্রস্তর ভজন দ্বারাই যদি হরি পাওয়া যায় তবে আমি তাহাও করিতে পারি। তৃণ-ভক্ষণে হরি যদি মিলিত তবে ছাগল ও হরিণই পরম ভক্ত হইত। পত্নী-ত্যাগই যদি হরিলাভের উপায় হইত তবে খোজারা তাকে পায় না কেন? দুগ্ধ-পান করিলে যদি ঈশ্বর দর্শন সম্ভব হইত, তবে শিশুগণই তাঁহাকে পাইত। মীরাবাই বলেন, সাধনার সহিত প্রেম সংযুক্ত না হইলে ঈশ্বরপ্রাপ্তি অসম্ভব। প্রেম ব্যতীত সাধন ভজন নিরর্থক ও নিষ্ফল।

পুলক দেখা যাইতেছে। ভজনের আর বিরাম নাই। গভীর রাত্রি অবধি সাধুভক্তগণ মীরার প্রেমাশ্রুপূর্ণ ভজন-শ্রবণে আত্মহারা ছিলেন। তাঁহারা রাত্রিতে বিশ্রামার্থ বিদায়

চতুর্থ মণি

থেরেসা নিউমান

ভগবান্ যীশু খ্রীষ্ট শত্রুহস্তে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করেন। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাঁহার হস্তপদাদি হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছিল। তাঁহার ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত মূর্তি ধ্যান করিয়া সেণ্ট ফ্র্যান্সিস ও সেণ্ট ক্যাথারাইনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে রক্ত নির্গত হইত। ফ্র্যান্সিস ও ক্যাথারাইন মধ্য যুগের মহাপুরুষ। বর্তমান যুগে এইরূপ দিব্য অবস্থা হইতে পারে, ইহা অনেকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ব্যাভেরিয়ার পানাহার ত্যাগিনী যোগিনী থেরেসা নিউমানের অনুরূপ অদ্ভুত অবস্থা বিংশ শতাব্দীতেও হইয়াছে। অধুনালুপ্ত রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী যোগানন্দ ১৯৩৫ খ্রীঃ আমেরিকা হইতে ভারতে আসিবার পথে ব্যাভেরিয়ায় যাইয়া কোনারস্রিউথ গ্রামে নিউমানের উক্ত অবস্থা দর্শনপূর্বক তাঁহার আত্মজীবনীর* ৩৯শ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। ফ্রেডারিক রিটার ভন লামা† নিউমান সম্বন্ধে ইংরাজিতে দুইখানি বই লিখিয়াছেন। ১৯৪৫ খ্রীঃ জার্মেণী হইতে আমেরিকান সংবাদদাতাগণ লিখিয়াছেন যে, নিউমান এখনও ব্যাভেরিয়ার কোনারস্রিউথ গ্রামে জীবিতা আছেন।

থেরেসা নিউমান ১৮৯৮ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। বিশ বৎসর বয়সে এক দুর্ঘটনায় আহত হইয়া তিনি অন্ধ ও পঙ্গু হন। সেণ্ট টেরেসার নিকট আকুল প্রার্থনা করিয়া নিউমান ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নষ্ট দৃষ্টিশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। আশ্চর্য উপায়ে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পঙ্গুত্বও সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ১৯২৩ খ্রীঃ হইতে তিনি একেবারে পানাহার ত্যাগ করিয়াছেন। রোজ সকালে ৬টার সময় টাকার

---

*স্বামী যোগানন্দ প্রণীত Autobiography of a Yogi নিউইয়র্ক ফিলজফিক্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

† Therese Neumann : A Stigmatist of our Day এবং Further Chronicles of Therese Neumann. উভয় গ্রন্থ ফ্রেডারিক রিটার ভন লামা প্রণীত। প্রকাশক—ব্রুস পাবলিশিং কোম্পানী, মিলওয়াকু।

আকারে কাগজের মত পাতলা চাউলের রুটী এক টুকরা তিনি প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। ১৯২৬ খ্রীঃ নিউমানের মস্তকে, বক্ষে ও হস্তপদে যিশু খ্রীষ্টের ন্যায় ক্ষত প্রথমে দেখা দিল। প্রত্যেক শুক্রবার তিনি খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার গ্রামের প্রচলিত জার্মাণ ভাষাই জানিতেন। কিন্তু শুক্রবার যখন তিনি উপরোক্ত দিব্যাবস্থা লাভ করেন তখন তিনি প্রাচীন আরামাইক ভাষায় কথা বলেন; কখনও বা হিব্রু, কখনও বা গ্রীক ভাষায়ও কথা বলেন।

কয়েকবার তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের অধীন হইতে হইয়াছিল। একটী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট জার্মাণ সংবাদপত্রের সম্পাদক ডাঃ ফ্রিট্জ গার্লিক কোনারস্রিউথ গ্রামে 'ক্যাথলিক ভণ্ডটীর ভণ্ডামি' জানিতে যান! তিনি নিউমানের অবস্থা দর্শনে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হন এবং তাঁহার জীবনী লিখিয়া প্রকাশ করেন। স্বামী যোগানন্দ ১৯৩৫ খ্রীঃ ১৬ই জুলাই ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত কোনারস্রিউথ নামক গণ্ডগ্রামে যাইয়া দেখেন, নিউমানের কুটীরের দ্বার রুদ্ধ। কুটীরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পার্শ্বে একটী ছোট কূপ ও চারি দিকে কয়েকটী ফুল গাছ। প্রতিবেশীর নিকট জানিলেন, নিউমান ৮০ মাইল দূরবর্তী আইকষ্টাট্ নামক স্থানের সেমিনারী-শিক্ষক অধ্যাপক উর্জের গৃহে গিয়াছেন। যোগানন্দজী পরদিবস আইকষ্টাটে উর্জের গৃহে যান। উর্জ তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। নিউমানের নিকট ভারতীয় দর্শকের আগমন সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি উত্তর পাঠাইলেন, 'যদিও বিশপ আমাকে কাহারো সংগে দেখা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তথাপি ভারতীয় সাধুর সহিত আমি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিব।' উর্জের গৃহের দ্বিতলে যোগানন্দজী যাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় নিউমান হাসিমুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে কাল গাউন ও মাথায় সাদা টুপী, মুখে অপূর্ব প্রশান্তি ও আনন্দ। যদিও তখন তাঁহার বয়স ছিল ৩৭ বৎসর তথাপি তাঁহাকে খুব তরুণী দেখাইতেছিল; শিশুসুলভ লালিত্য ও মাধুর্যের মূর্তি! দেহ স্বাস্থ্যবান ও পরিপুষ্ট, গণ্ডদেশ সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মত রঙিন ও প্রফুল্ল।

অধ্যাপক উর্জ দোভাষীর কাজ করিলেন। নিউমান হিন্দু সাধু এইবার প্রথম দেখিলেন। হিন্দু সাধু দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। স্বামী যোগানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি কিছু পান বা আহার করেন না?' নিউমান উত্তর দিলেন, 'না। আমি কিছুই পানাহার করি না। মাত্র সকালে এক

টুকরা চালের রুটী (একটী টাকার আকারে) প্রসাদরূপে খাই। নিবেদিত না হইলে তাহাও গলাধঃকরণ করিতে পারি না।' প্রশ্ন—দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পানাহার ব্যতীত কিরূপে বাঁচিয়া আছেন? উত্তর—"আমি ঈশ্বরের আলোকে জীবিতা আছি। ক্রাইষ্ট সত্যই বলিয়াছেন, 'মানুষ ঈশ্বরের বাক্যেই জীবনধারণ করে, আহারের দ্বারা নহে।' আমি যে আজও পৃথিবীতে আছি তাহার অন্যতম কারণ, মানুষ আহারের দ্বারা বাঁচে না, ঈশ্বরের অদৃশ্য জ্যোতিঃতেই বাঁচে—ইহার প্রমাণ দিবার জন্য।" প্রশ্ন—আপনি কি অপরকে শিখাইতে পারেন কিরূপে বিনা আহারে বাঁচিয়া থাকা যায়? উত্তর—"না। তাহা আমি পারি না; তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাও নহে।"

তাঁহার সবল ও সুন্দর দুই হস্তে নিউমান দুইটী শুষ্ক ক্ষতস্থান দেখাইলেন। ক্ষত-স্থানটী হাতের চেটোতে চতুষ্কোণ এবং হাতের পীঠে অর্ধচন্দ্রাকৃতি, লোহার পেরেকের মাথা ও অগ্রভাগের মত। এইরূপ পেরেকের দ্বারা খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন। নিউমান বলিলেন, প্রত্যেক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রি হইতে শুক্রবার বৈকাল একটা পর্যন্ত আমার ক্ষতস্থানগুলির মুখ খুলিয়া যায় ও রক্ত পড়ে। তজ্জন্য আমার ১২১ পাউন্ড ভারী শরীরের ১০ পাউন্ড ওজন কমিয়া যায়। এই সময় আমি অবশ্য দ্রষ্টার মত খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা ভাবনেত্রে দর্শন করি। সমবেদনামূলক প্রেমে আমি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি। তথাপি প্রত্যেক সপ্তাহে উক্ত দর্শনের জন্য মন আকুল হয়। অধ্যাপক উর্জ বলিলেন, "নিউমানপ্রমুখ আমাদের একটী দল মাঝে মাঝে কয়েক দিন ব্যাপী ভ্রমণে বহির্গত হই জার্মেণীর বিভিন্ন অংশে। আমরা রোজ তিন বার খাই; কিন্তু নিউমান কিছুই পানাহার করেন না। পানাহার ব্যতীতও তিনি সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের মত সতেজ ও সুন্দর থাকেন। ক্লান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পানাহার সত্ত্বেও আমরা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হই। আমরা যখন ক্ষুধিত হইয়া পথিপার্শ্বস্থ চটীর সন্ধান করি তখন নিউমান মৃদু হাস্য করিতে থাকেন। তিনি আহার করেন না বলিয়া তাঁহার পেটটী সংকুচিত হইয়াছে। তিনি মলমূত্রও ত্যাগ করেন না। তাঁহার গাত্রচর্ম কোমল ও দৃঢ় এবং উহা হইতে ঘর্ম নির্গত হয়।"

নিউমানের দুটী ভ্রাতা বলিলেন, তাঁহাদের ভগ্নী রাত্রিতে মাত্র দুই এক ঘণ্টা নিদ্রা যান। দেহে বহু ক্ষত থাকা সত্ত্বেও নিউমান কর্মক্ষম ও উদ্যমশীল। তিনি পক্ষীদের ভালবাসেন, একটী মৎস্যাগারের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং বাগানে ফুল

গাছের যত্ন করেন। তাঁহার নিকট পৃথিবীর নানা স্থান হইতে ক্যাথলিক সাধুগণ ও ভক্তগণ পত্র লেখেন। তিনি পত্রের উত্তর যথাসাধ্য দেন। অনেকে স্ব স্ব রোগা-রোগ্যের প্রার্থনা জানাইয়া কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফার্ডিন্যান্ড বলিলেন, নিউমান অপরের রোগ স্বীয় শরীরে লইতে পারেন। এইরূপে তিনি বহু আশীর্বাদপ্রার্থীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। প্রার্থনা দ্বারা তিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারেন। স্থানীয় একটী যুবক সন্ন্যাসী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। তিনি হঠাৎ গলরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। নিউমান প্রার্থনার বলে উক্ত যুবকের গলরোগ স্বীয় দেহে টানিয়া আনেন। তখন হইতেই তিনি পানাহার ত্যাগ করিয়াছেন।

নিউমানের প্রাত্যহিক ভাবাবস্থা-দর্শন মানসে শত শত, সহস্র সহস্র দর্শনার্থী নানা দূর দূর স্থান হইতে শুক্রবার কোনারস্‌রিউথ গ্রামে উপস্থিত হন। এই জন্য স্থানীয় গির্জার পাদ্রীর অনুমতি লইয়া দর্শন করিবার নিয়ম করা হইয়াছে। তাঁহার কুটীরের একাংশ মোটা কাচ-নির্মিত। পর্যাপ্ত সূর্যালোক গৃহে আনার জন্যই উক্ত ব্যবস্থা। স্বামী যোগানন্দ শুক্রবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, নিউমান শুভ্র পোষাকে শয্যায় শায়িতা। তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের নিম্ন পাতা হইতে এক ইঞ্চি পরিসর রক্তস্রোত ক্ষীণভাবে বহিতেছে। দৃষ্টি ভ্রূযুগলমধ্যে নিবন্ধ, ভাবাবিষ্ট। মাথায় যে সাদা কাপড় জড়ান ছিল তাহা 'কণ্টকময় মুকুট পরিধানের ক্ষত' হেতু রক্তসিক্ত। খ্রীষ্টের বক্ষের এক পার্শ্বে বিশ শতাব্দী পূর্বে এক অসুর-স্বভাব সৈন্য বর্শা বিদ্ধ করিয়াছিল। সেইরূপ ক্ষত নিউমানের বক্ষপার্শ্বে হওয়ায় তাঁহার সাদা পোষাকেও রক্তের দাগ লাগিয়াছে। তাঁহার হস্তদ্বয় মাতৃভাবে প্রসারিত, মুখ প্রসন্ন ও জ্যোতির্ময়। তিনি বিদেশী ভাষায় অস্পষ্ট ভাবে যোগনেত্রে দৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে কি যেন বলিতেছেন। কথা বলিবার সময় তাঁহার ওষ্ঠাধর যন্ত্রণায় ব্যথিত ও কম্পিত। উপহাসকারী জনমণ্ডলীর মধ্যে খ্রীষ্ট ভারী ক্রুশটী বহন করিলেন। এই দৃশ্য তিনি ধ্যাননেত্রে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ ক্রুশের ভারে খ্রীষ্ট ভূপতিত হইলেন। ইহা দর্শনে ব্যথিতা ও শঙ্কিতা হইয়া নিউমান মাথা তুলিয়া বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইলেন। তৎপরে তাঁহার দর্শন অন্তর্হিত হইল। খ্রীষ্টের শেষ আহার হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু ও কবর দেওয়া পর্যন্ত সকল দৃশ্যই নিউমান ভাবচক্ষে প্রতি সপ্তাহে দর্শন করেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া যেমন দেহে ও মনে শ্রীকৃষ্ণ-

ভাবে রূপায়িত হইতেন, সেণ্ট ফ্রান্সিস, সেণ্ট ক্যাথারাইন এবং থেরেসা নিউমানও তদ্রূপ খৃীষ্টের ধ্যানে তদাকারে আকারিত হন। ইহা শাস্ত্রসম্মত, অবিশ্বাস্য নহে। আধ্যাত্মিক রহস্য বৈজ্ঞানিক রহস্য অপেক্ষা আরও অদ্ভুত, আরও বিস্ময়কর।

পঞ্চম মণি

অঘোরমণি দেবী

দক্ষিণেশ্বরের দুই তিন মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্ব তীরে কামারহাটী গ্রাম। তথায় কলিকাতার পটলডাঙ্গা পল্লীর গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবোদ্যান ও রাধামাধব মন্দির। উক্ত মন্দিরের পূজারী ছিলেন কামারহাটীর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ কাশীনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র নীলমাধব। নীলমাধবের গৃহ মন্দিরের অদূরে অবস্থিত। গোবিন্দ দত্তের দেহত্যাগের পর তাঁহার বিধবা পত্নী এই দেবোদ্যানে অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। নীলমাধবের বিধবা ভগ্নী অঘোরমণির সহিত দত্ত-পত্নীর গভীর প্রীতি ছিল। অঘোরমণির জন্ম হয় আন্দাজ ১৮২২ খৃীঃ এবং বিবাহ হয় সম্ভবতঃ ১৮৩১-৩২ খৃীঃ নয় দশ বৎসর বয়সে। তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী ছিল ২৪ পরগণা জেলার বোদড়ার অন্তর্গত পাইগহাটী গ্রামে। তিনি তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিধবা হন। বিবাহের সময়েই পতিদর্শন ও শ্বশুরগৃহে গমন প্রথম ও শেষ বার।

বালবিধবা অঘোরমণি ততদিন কেশদাম ফেলিতে পারেন নাই যতদিন মাতা-পিতা জীবিত ছিলেন। তাহার পরই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বালিকা ব্রহ্মচারিণীর মত মুণ্ডিতমস্তক হন। শ্বশুর-বাড়ী হইতে প্রাপ্ত কিছু ধানজমি বিক্রয় করিয়া তিনি কয়েক শত টাকা পান। এই টাকার কোম্পানি কাগজ করিয়া দত্তগিন্নীর নিকট গচ্ছিত রাখেন। পিত্রালয়েই বৈধব্যের বার তের বৎসর কাটিল। এই সময় গঙ্গাস্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, ও পূজাপাঠাদিতে অভ্যস্ত হইলেন। ঈশ্বরচিন্তায় মন মাতিল। শ্বশুরবাড়ীর কুলগুরুকে আনাইয়া পিত্রালয়েই গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিতা হইলেন। স্বগৃহের পরিবেশ আর ভাল লাগিল না। গোবিন্দ দত্তের ঠাকুর-বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন পূজা ও আরাত্রিকাদি দেখিতে এবং দত্ত-গৃহিনীর সহিত গল্প করিতে। ঠাকুর-বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে থাকিতে চাহিলে দত্ত-গৃহিনী পরমানন্দে সম্মতি দিলেন। বোধ হয়, চাকরদের জন্য প্রথমে নির্মিত একতলার একটী ক্ষুদ্র কক্ষ অঘোরমণির বাসার্থ নির্দিষ্ট হইল। এই কক্ষে অঘোরমণি বাহান্ন বৎসরেরও অধিককাল, আন্দাজ ১৮৫২ হইতে ১৯০৪ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত, কাটান। নিজের যে কয়েক শত

টাকা ছিল তহা হইতে মাসিক কয়েক টাকা সুদ পাইতেন। তাহাতেই দিন কাটাইতে হইত। হাটে এক সপ্তাহের তরীতরকারী কিনিয়া রাখিতেন। আলু, উচ্ছে ও মুগের ডাল সিদ্ধ, আর ভাত ছিল দুপুরের আহার। বাগানের নারিকেল প্রস্তুত লাড়ু দুই-একটী ও দুধ একটু রাত্রে খাইতেন। বাগানের গাছের শুক্‌না পাতা, ডালপালা কুড়াইয়া তাহারই জ্বালে ভাত রাঁধিতেন। গোপালকে ভাত্‌তরকারী নিবেদন করিয়া তাহাই প্রসাদ-জ্ঞানে খাইতেন। কাঠ পাতা কুড়াইবার সময়ে একটি ছোট সুশ্রী ছেলে কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিত। সেই ছেলেকে পরে ধ্যানের সময় স্বীয় ইষ্টমূর্তিতে মিলাইয়া যাইতে দেখেন। ছেলেটী তাঁহাকে এক সময় মৃদু মধুর কণ্ঠে ইহাও বলিয়াছিল, "তুমি বাৎসল্যভাবে সাধন করো। কাঠপাতা কুড়াইতে তোমার একা কষ্ট হয় তাই আমিও তোমাকে সাহায্য করি। তুমি রান্না করিয়া আমাকে খাইতে দাও তাহাতে আমি বড় তৃপ্তি পাই।"*

অঘোরমণির কক্ষ গোবিন্দ দত্তের বৃহৎ অট্টালিকার অন্দর মহলের শেষাংশে অবস্থিত, নির্জন, নীরব। কক্ষের দক্ষিণের তিনটী জানালা দিয়া সুন্দর গঙ্গাদর্শন হইত। ব্রাহ্মণী এই ঘরে বসিয়া গঙ্গাদর্শন ও দিবারাত্রি জপ করিতেন। এই ঘরে ত্রিশ বৎসর জপ করিয়া সাধিকা সিদ্ধা হন। তিনি ভগবান্‌কে পুত্ররূপে, গোপালভাবে উপাসনা করিতেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাকে বাৎসল্য-ভাব সাধন বলে। অঘোরমণির ষোল আনা মন গোপালের চিন্তায় ডুবিল। কাহারো সঙ্গে দেখা করিতে বা কথা বলিতে তাঁহার আর ইচ্ছা রহিল না।

তিনি স্বল্পহারী ও স্বল্পভাষী ছিলেন। রাত্রি দুইটায় উঠিয়া তিনি জপে বসিতেন এবং সকাল আটটা নয়টা পর্যন্ত জপে মগ্ন থাকিতেন। তারপর তিনি রাধা-মাধব মন্দিরে ঝাঁট দেওয়া, ধোয়ামোছা, পূজার বাসন মাজা, ফুল তোলা, মালা গাঁথা, চন্দন বাটা প্রভৃতি কাজ কিছু কিছু করিতেন। তদন্তে রান্না করিয়া গোপালকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতেন। তারপর একটু বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত জপে বসিতেন। সন্ধ্যা সমাগমে মন্দিরে আরাত্রিক দর্শন ও ভজন শ্রবণ করিতেন। অনন্তর আবার জপে বসিতেন গভীর রাত্রি পর্যন্ত। এইরূপে ১৮৫২-১৮৮৩ খৃীঃ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর সাধিকার একটানা তপস্যা চলিল।

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪৬ আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্বামী নির্লেপানন্দের প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখুন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ। আকাশ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। নাতিশীতোষ্ণ হেমন্ত। অঘোরমণি গোবিন্দ দত্তের বিধবা পত্নী ও অন্য এক রমণীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁহাদিগকে সাদরে স্বকক্ষে বসাইয়া ভক্তিবিষয়ক উপদেশ দেন ও ভজন গাহিয়া শুনান এবং পুনরায় আসিতে বলিয়া বিদায় দেন। ফিরিবার সময় গিন্নী শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার কামারহাটীস্থ ঠাকুর-বাড়ীতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও একদিন সুবিধামত যাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণকে অঘোরমণির প্রথম দর্শন। ইহার অল্প দিন পরে জপ করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিবার ইচ্ছা হইবামাত্র অঘোরমণি দুই তিন পয়সার শুষ্ক সন্দেশ কিনিয়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন—"এসেছ, আমার জন্য কি এনেছ দাও।" অঘোরমণি বলেন, "আমি তো একবারে ভেবে অজ্ঞান, কেমন করে সে খারাপ সন্দেশ বার করি। এঁকে কত লোকে কত কি ভাল ভাল জিনিব এনে খাওয়াচ্ছে।" ভয়ে লজ্জায় কিছু না বলিতে পারিয়া সেই সন্দেশগুলি বাহির করিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উহা মহানন্দে খাইতে খাইতে বলিলেন, "তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আনো কেন? নারিকেল লাড়ু করে রাখবে। তাই দুটো একটা করে আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে—লাউশাকের চচ্চড়ি, আলু-বেগুন-বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারী, তাই নিয় আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।" অঘোরমণি বলেন, "ধর্মকর্মের কথা দূরে গেল, কেবল খাবার কথা হতে লাগ্‌লো। আমি ভাব্‌তে লাগলুম, ভাল সাধু দেখতে এসেছি। কেবল খাবার কথা বলেন। আমি গরীব কাঙ্গাল লোক। এত খাবার কোথায় পাব? দূর হোক, আর আসবো না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন পেরিয়েছি এমনি যেন পেছন থেকে তিনি টান্‌তে লাগলেন। কোন মতে এগুতে আর পারি না! কত কোরে মনকে বুঝিয়ে টেনে হিঁচড়ে তবে কামারহাটী ফিরি।" ইহার কয়েক দিন পরেই আবার অঘোরমণি চচ্চড়ি রাঁধিয়া হাতে লইয়া তিন মাইল হাঁটিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ববৎ আনীত খাবার চাহিয়া খাইলেন এবং 'আহা কি রান্না! যেন সুধা, সুধা!' বলিয়া আনন্দ করিলেন। তাহা দেখিয়া অঘোরমণির চোখে জল আসিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি গরীব কাঙ্গাল

বলিয়া বোধ হয়, আমার সামান্য জিনিষের এত বড়াই করিতেছেন।'*

এইরূপে দুই চারি মাস ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে অঘোরমণি যাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণও কামারহাটীতে গমন করেন। তথায় তিনি গোবিন্দ দত্তের মন্দিরে দেবমূর্তির পূজাদি দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। সেবার তিনি দেবমূর্তির সম্মুখে কীর্তনাদি করিয়া প্রসাদ পাইবার পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন। কীর্তন-কালে তাঁহার দিব্য ভাবাবেশ দেখিয়া অঘোরমণিপ্রমুখ সকলে মুগ্ধ হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কুসুমাকর বসন্তকাল। পত্র-পুষ্প-গীতিপূর্ণ বসুন্ধরা অপূর্ব শোভায় মণ্ডিতা। বিশেষতঃ রাত্রিগুলি পরম রমণীয় ও ভাবোদ্দীপক। অঘোরমণি রাত্রি তিনটার সময়ে জপে বসিয়াছেন। জপ সমাপ্ত হইলে তিনি ইষ্ট দেবতা গোপালকে জপ সমর্পণ করিবার পূর্বে প্রাণায়াম আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময়ে দেখেন, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব তাঁহার পার্শ্বে বাম দিকে উপবিষ্ট। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে যেমন দর্শন করেন, এখনও সেইরূপ স্পষ্ট ও জীবন্ত দেখিলেন। বিস্মিত হইয়া অঘোরমণি ভাবিলেন, 'একি? এখন ইনি কেমন করে এখানে এলেন?' তিনি অবাক্ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, আর ঐ কথা ভাবিতেছেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বসিয়া বসিয়া মৃদু মধুর ভাবে হাসিতেছেন। তারপর অঘোরমণি সাহসে ভর করিয়া বাম হাত দিয়া যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের বাম হাতখানি ধরিলেন, অমনি সে মূর্তি অন্তর্হিত হইল। আর তাঁর ভেতর থেকে বালগোপাল বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এক হাত তুলে অঘোর-মণির মুখপানে চেয়ে বললেন, 'মা, ননী দাও।' গোপালের কি রূপ, আর কি চাহনি! অঘোরমণি তাহা দেখিয়া শুনিয়া একেবারে চমৎকৃতা হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অন্দরমহলে লোক ছিল না, নচেৎ সে উচ্চ চীৎকারে লোক ছুটিয়া আসিত। অঘোরমণি কাঁদিয়া গোপালকে বলিলেন, "বাবা, আমি দুখিনী, কাঙালিনী। আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথায় পাব বাবা?" কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তাহা শুনে? কেবল বলে, 'খেতে দাও।' তখন অঘোরমণি কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া শিকা হইতে শুক্‌না নারিকেল লাড়ু লইয়া গোপালের হাতে দিলেন। অঘোরমণির নিয়মিত জপ আর সম্ভব হইল না। গোপাল আসিয়া তাঁহার কোলে বসেন, মালা

---

*স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' (গুরুভাব, উত্তরার্ধ) ২৫৪-২৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

কাড়িয়া লন, কাঁধে চড়েন, ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ান! সকাল হইতেই গোপালের মা পাগলিনীর মত ছুটিয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গেলেন। গোপালও মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া চলিলেন। এক হাত গোপালের পাছায়, অন্য হাত গোপালের পিঠে দিয়া, বুকে ধরিয়া অঘোরমণি সমস্ত পথ চলিলেন। পথে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি তাঁহার বুকের উপর ঝুলিতেছে।

সকাল বেলা সাতটা কি সাড়ে সাতটার সময় গোপালের মা কালী বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার চেহারা এলোথেলো পাগলের মত। দুই চক্ষু যেন কপালে উঠিয়াছে, আঁচল মাটীতে লুটাইতেছে, অন্য কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে ঢুকিয়া তিনি তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ব্রহ্মগোপালভাবে আবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার কোলে বসিলেন। গোপালের মার দুই চক্ষুতে তখন দরদর ধারে প্রেমাশ্রু পড়িতেছিল। তিনি যে ক্ষীর সর ননী আনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তুলিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। ভাবাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে পারিতেন না, কোলে বসা ত দূরের কথা। কিন্তু তাঁহার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর যখন যশোদাভাব হইত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালভাবে তাঁহার কোলে যাইয়া বসিতেন। আর বসিলেন, এই অঘোরমণির কোলে। একটু পরে শ্রীরামকৃষ্ণের গোপালভাব কমিল এবং তিনি স্বীয় চৌকিতে যাইয়া বসিলেন। গোপালের মার সে ভাব আর থামে না! আনন্দে আটখানা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া পাগলের মত ঘরময় নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া হাসিয়া সমবেত স্ত্রীভক্তদের বলিলেন, 'দেখ, দেখ, এ আনন্দে ভরে গেছে। ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে।' অঘোরমণির যখন গোপাল দর্শন হইত তখন তিনি আর এক মানুষ হইয়া যাইতেন। চপল গোপাল কখনো বা শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গে মিশাইয়া গেলেন, কখনো বা উজ্জ্বল বালকমূর্তিতে অঘোরমণির সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গোপালভাবের প্রবল তরঙ্গে ব্রাহ্মণী জগতের ও দেহের জ্ঞান হারাইলেন।

এখন হইতে অঘোরমণি সত্যই 'গোপালের মা' হইলেন। রমণী জননী হইলেন, নারীত্ব মাতৃত্বে পরিণত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণও অঘোরমণিকে গোপালের মা বলিয়া ডাকিতেন। কামারহাটী ফিরিবার সময় ভাবদৃষ্ট বালক গোপালও পূর্বের ন্যায় তাঁহার মায়ের কোলে চাপিয়া চলিলেন। ঘরে ফিরিয়া গোপালের মা পূর্বাভ্যাসে জপ করিতে বসিলেন। কিন্তু গোপাল মায়ের সঙ্গে নানা রঙ্গ, নানা আবদার করিতে

লাগিলেন। সাধিকা শেষে উঠিয়া গোপালকে কাছে লইয়া তক্তাপোষের উপর বিছানায় শয়ন করিলেন। তিনি তক্তাপোষের উপর সামান্য মাদুরে শুইতেন, নরম বিছানা বা বালিশ তাঁহার ছিল না। গোপাল শুধু মাথায় শুইয়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিলেন। অগত্যা ব্রাহ্মণী স্বীয় বাম বাহুপরি গোপালের মাথা রাখিয়া তাঁহাকে কোলের গোড়ায় শোয়াইয়া কত কি বলিয়া দেবশিশুকে এইভাবে ভুলাইতে লাগিলেন, "বাবা! আজ এই রকমে শোও। রাত পোয়ালেই কাল কল্‌কাতা গিয়ে যজ্ঞেশ্বরী (গিন্নীর বড় মেয়ে) কে বলে তোর জন্য তুলোর বিচি ঝেড়ে নরম বালিশ করিয়ে দেবো।" অঘোরমণি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া গোপালকে উদ্দেশ্যে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইতেন। উক্ত ঘটনার পরদিন সকাল সকাল রাঁধিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে শুক্‌নো কাঠ কুড়াইতে গেলেন। গোপালও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতে এবং রান্নাঘরে আনিয়া জমা করিতে লাগিলেন। এইরূপে মায়ে পোয়ে কাঠ কুড়ান হইল। রান্নার সময়ও দুরন্ত গোপাল কখনো মায়ের কাছে বসিয়া, কখনো মায়ের পিঠের উপর পড়িয়া সব দেখিতে লাগিলেন, কত কি বলিলেন, কত কি আবদার করিলেন! দেবমাতাও কখন মিষ্ট বাক্যে তাহাকে শান্ত করিলেন, কখন বা বকিলেন।

একদিন গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে গিয়াছেন এবং পূর্বাভ্যাসের বশে নহবতে বসিয়া নিয়মিত জপ সাঙ্গ করিয়া প্রণামান্তে উঠিতেছেন। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী হইতে তথায় আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি এখনও অত জপ কর কেন? তোমার ত খুব দর্শনাদি হয়েছে।' এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ কথাবার্তার পর গোপালের মা জপের মালা ও ঝুলি সব গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। গোপালের কল্যাণের জন্যই তিনি জপ করিতেন। অনেক দিন বাদে আবার একটা মালা নিয়াছিলেন। গোপালের কল্যাণের জন্য সেই মালা ফিরাইতেন। এখন হইতে অঘোরমণির জপতপ শেষ হইল। গোপাল তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিলেন। গোপাল-ভাবতরঙ্গে তাঁহার নিয়ম নিষ্ঠাও ভাসিয়া গেল। আর নিয়ম নিষ্ঠা রাখিবেন কিরূপে? গোপাল ত যখন তখন খাইতে চায়; আবার নিজে খাইতে খাইতে মায়ের মুখে গুঁজিয়া দেয়। তাহা কি ফেলিয়া দেওয়া যায়? আর ফেলিয়া দিলে গোপাল যে কাঁদে! শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় অঘোরমণি বুঝিলেন, 'নবীন-নীরদ-শ্যাম-নীলেন্দীবরলোচন' শ্রীকৃষ্ণই গোপালরূপে তাঁহার সঙ্গে লীলা করিতেছেন। এইরূপে অনবরত দুই মাস কাল গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দিবারাত্রি বুকে পিঠে

করিয়া ব্রাহ্মণী এক সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন! এইরূপ দুর্লভ উপলব্ধি, এইরূপ দিব্য দর্শন কয়জন ভাগ্যবতীর হয়? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'কলিযুগে এরূপ দিব্য দর্শন হলে একুশ দিনের বেশী শরীর থাকে না; একুশ দিনের পর শরীর শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে।' গোপালের মার এইরূপ নিত্য দর্শন বাইশ বৎসর যাবৎ হইয়াছিল।

দুই মাসের পর গোপালের মার দর্শনাদি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা কমিয়া গেল। তবে একটু স্থির ভাবে বসিয়া গোপালের চিন্তা করিলেই পূর্ববৎ তাঁহার দর্শন পাইতেন। ইহাতে যেন কেহ মনে করিয়া না বসেন, ইহার পরে তাঁহার কালে ভদ্রে কখন গোপালমূর্তির দর্শন হইত। তাহা নহে। প্রত্যহ তিনি দুই দশবার গোপালের দর্শনাদি পাইতেন। যখনই গোপালকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হইত তখনই তাঁহাকে দেখিতেন। আবার যখনই কোন বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার প্রয়োজন হইত তখনই গোপাল সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইয়া সঙ্কেতে, কথায় বা হাতে নাতে দেখাইয়া মাতাকে এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গে বার বার মিশিয়া যাইয়া গোপাল তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন, তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ অভিন্ন। গোপাল তাঁহার মানবী মাতাকে বুঝাইয়াছিলেন, ভক্তগণ ও তিনি অভেদ, ভক্ত ও ভগবান এক! একদিন খাইবার সময়ে অঘোরমণি গোপালভাবে, গোপালপ্রেমে গদ্‌গদ্ হইয়া সমাগতা স্ত্রীভক্তদিগকে গোপালভাবে, নিজের হাতে ভাত খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী মাহেশে রথযাত্রা দেখিতে যাইয়া তিনি সর্বভূতে গোপালের দর্শন পাইয়া আনন্দিতা হন। তিনি বলিতেন, 'তখন রথ, রথের উপর জগন্নাথদেব, যাহারা রথ টানিতেছে সেই অপার জনসঙ্ঘ—সকলের মধ্যেই দেখিলাম গোপালকে, গোপালই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে মাত্র।' কুরুক্ষেত্রে যেমন অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছিল তদ্রূপ দর্শন মাহেশে অঘোরমণির হইল। উন্নত সাধক বা সাধিকার সাধনার শেষে এই দুর্লভ অনুভূতি হয়। বৃন্দাবনের গোপীদেরও সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল। গোপালের বিশ্বরূপ দেখিয়া অঘোরমণি প্রেমোন্মত্তা ও বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইলেন। এই সম্বন্ধে তিনি জনৈকা স্ত্রীবন্ধুকে বলেছিলেন, 'তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না, নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র করেছিলেম।'

একদিন দক্ষিণেশ্বরে গোপালের মা ও নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের সহিত গোপালের মার

পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে গোপালের মা নরেন্দ্রনাথের নিকট স্বীয় দর্শনাদির কথা বিবৃত করিয়া সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্। আমি দুঃখী কাঙ্গালী, কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। তোমরা বল, আমার এসব দর্শন মিথ্যা নয় ত?' নরেন্দ্রনাথও বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, 'না মা, তুমি যা দেখেছ সে সব সত্য।' নরেন্দ্রনাথের নিকট স্বীয় দর্শনাদি বর্ণনাকালে বৃদ্ধা গোপালরূপী শ্রীভগবানকে পুনরায় দেখিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ বৃদ্ধার ভাবাবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহার অলৌকিক দর্শনাদির কথা শুনিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করেন তখন তাঁহার সঙ্গে শ্রীমতী সারা সি. বুল, কুমারী জোসেফাইন ম্যাকলিয়ড এবং ভগ্নী নিবেদিতা আসেন। গোপালের মা নিবেদিতাকে যেদিন প্রথম দেখেন সেদিন স্বামী সদানন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাগবাজারের রাস্তায় উভয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। গোপালের মা সদানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও গুপ্ত, এটী কেরে? একি নরেনের মেয়ে যে তার সঙ্গে এসেছে?' তখন ব্রাহ্মণী নিবেদিতাকে সস্নেহে দুএকটি কথা বলিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার ডান হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। নিবেদিতা পরে বলিতেন, 'যখন গোপালের মা আমার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন আমার দেহ আনন্দে শিহরিয়া উঠিল, রোমাঞ্চ হইল। প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দের প্রবাহ বহিল, নূতন প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিলাম।' সকলের মধ্যে গোপালকে দেখিয়া ব্রাহ্মণী সকলের স্নেহময়ী মাতা হইয়াছিলেন। মাতৃত্বই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ স্নেহের অনন্ত উৎস। মাতৃত্বই হিন্দু নারীর আদর্শ। মহিলাগণের সঙ্গে নিবেদিতা একদিন কামারহাটীতে গোপালের মাকে দেখিতে যান এবং তাঁহার কথায় ও আদরে বিশেষ আপ্যায়িতা হন। অঘোরমণি তাঁহার গোপালকে সেদিন তাঁহাদের ভিতরেও অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের দাড়ি ধরিয়া সস্নেহে চুম্বন করেন, এবং নিজের বিছানায় সাদরে বসাইয়া মুড়ি নারিকেল লাড়ু প্রভৃতি যাহা ঘরে ছিল তাহা খাইতে দেন, এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার দর্শনাদির কথা কিছু কিছু বলেন। তাঁহারাও সামান্য আহার্য্য ভক্ষণ ও তাঁহার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া মোহিত হন এবং ঐ মুড়ির কিছু আমেরিকায় লইয়া যাইবেন বলিয়া চাহিয়া লন। ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহাদের কামার-

হাটী গমনের বৃত্তান্ত তাঁহার বিখ্যাত ইংরাজি গ্রন্থে* এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।— "আমরা কয়েকজন এক পূর্ণিমা রজনীতে গোপালের মাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের ছোট নৌকাখানি যখন নদীবক্ষে চলিতেছিল তখন গঙ্গার কি মনোহর শোভা! নৌকা হইতে নামিয়া গঙ্গাঘাটের সুন্দর, সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া আমরা গোপালের মার ক্ষুদ্র কক্ষে পৌঁছিলাম। কক্ষটি সম্ভবতঃ প্রথমে ভৃত্যদের আবাসগৃহরূপে অট্টালিকার এক পার্শ্বে নির্মিত হইয়াছিল। গোপালের মা এই কক্ষে বহু বৎসর নিবাস ও তপস্যা করেন। তক্তপোষের উপর পাথরের মত শক্ত শয্যায় সাধিকা শয়ন করিতেন। আলনায় ছেঁড়া মাদুরটি গুটান থাকিত। অতিথি আসিলে তাহা মেজেতে বিছাইয়া দিতেন। ছাদ থেকে ঝুলান একটি শিকায় মাটীর হাঁড়িতে কিছু মুড়ি ও মিছরি থাকিত। কেহ আসিলে ইহার কিঞ্চিৎ তাহাকে সস্নেহে দিতেন। মালার ঝুলীটি তাকে ছিল। এই মালা জপিয়াই গোপালের মা সিদ্ধা হন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, কত বৎসর ধরিয়া যে তিনি জপমগ্ন ছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।...গোপালের মা বৃদ্ধা সাধিকা। পনের বিশ বৎসর পূর্বে যখন তিনি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন তখন তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালের মাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ব-পরিচিতের ন্যায় অভ্যর্থনা করেন, যেন তিনি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন! ব্রাহ্মণী তাঁহার ইষ্টদেবতা গোপালকে ভাবচক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রকাশিত দেখেন। কি নিষ্ঠার সহিত তিনি উক্ত অনুভূতির মর্য্যাদা আজীবন্ রক্ষা করিয়াছিলেন? শ্রীরাম-কৃষ্ণকে তিনি আর কখনো প্রণাম করেন নাই, তাঁহাকে সন্তানবৎ দেখিতেন, এবং তুমি বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে জননীবৎ ভক্তি করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদাদেবীকে গোপালের মা 'বউমা' বলিতেন। ভগ্নী নিবেদিতাপ্রমুখ পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাগণ গোপালের মাকে দেখিয়া ফিরিলে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আহা! তোমরা প্রাচীন ভারতের মহান্ আদর্শ দেখিয়াছ। উপাসনা ও অশ্রুপাত, জাগরণ ও উপবাস, ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চরণের ভারত অতীত হইতেছে, আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না!"

১৮৮৬ খৃীঃ শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শন হইলে অঘোরমণির অশান্তির সীমা রহিল

---

*'The Master as I saw Him' পুস্তকের ১৫১—১৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

না। অনেক দিন আর কামারহাটী ছাড়িয়া কোথাও যান নাই, একলা নির্জনে ধ্যান-জপে থাকিতেন। তৎপরে পুনরায় পূর্ববৎ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাদি পাইয়া শান্ত হন। এখন হইতে প্রাণে অশান্তি আসিলেই বরাহনগরে, আলমবাজারে বা বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের নিকট আসিতেন এবং আসিলেই শান্তি পাইতেন। যেদিন তিনি মঠে আসিতেন সেদিন সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভোগ নিবেদন করিতে অনুরুদ্ধ হইতেন। গোপালের মাও সানন্দে নিজ হস্তে দুই একখানা তরকারী রাঁধিয়া গোপালকে ভোগ দিতেন। তিনি মঠে আসিলে সমস্ত দিন থাকিতেন, কখনও বা দুই এক রাত্রি কাটাইতেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে এক বৈকালে গোপালের মা বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে আসিয়াছেন। এই বাড়ীতে তিনি বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনেক সাধু ও ভক্তের সমাগম হইল। তন্মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং ধর্ম বিষয়ক দুরূহ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সরলা বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ওগো আমি যে মেয়ে মানুষ, বুড়ো হাবা। আমি কি তোমাদের শাস্ত্রের কথা জানি? তোমরা শরৎ, যোগেন, নরেন, তারককে জিজ্ঞাসা করগে যাও না?' কিন্তু সকলে জিদ করায় গোপালের মা বলিলেন, 'তবে দাঁড়াও বাপু, গোপালকে জিজ্ঞেস্ করি। ও গোপাল, গোপাল! ওরে, ওরা কি জিজ্ঞেস্ কচ্ছে। আমি কি কিছু বুঝি? এরা শাস্ত্রের কথা বল্‌ছে। তুই বাপু, এদের বলে দেনা।' ইহা শুনিয়া সকলেই উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিলেন। গোপাল যাহা বলিলেন তাহা ব্রাহ্মণী সকলকে এইরূপে বলিলেন, 'ওগো! গোপাল এই বল্‌ছে।'...এইভাবে বহু জটিল প্রশ্নের অদ্ভুত উত্তর দিলেন। সকলেই স্তম্ভিত ও হর্ষিত! অধিকাংশ লোকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। কেবল দুই তিন জনের প্রশ্ন তখন বাকী ছিল। এমন সময় ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'ও গোপাল, গোপাল! তুই চলে যাচ্ছিস্ কেন? ফিরে আয় না আমার কোলে! তোর বাপু কেবল খেলা ও ছুটাছুটি! ওদের কথার উত্তর দে।' কিন্তু গোপাল তখন মায়ের কথা না শুনিয়া চলিয়া গেলেন।*

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগকালে গোপালের মা কামারহাটীতে ছিলেন, নিজের ঘরের মেজেতে দাঁড়াইয়াছিলেন। সংবাদ শুনিবামাত্র মেজেতে পড়িয়া

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩২ ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ দেখুন।

গেলেন এবং অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'এ্যাঁ? নরেন নেই?' পতনের ফলে কনুইয়ের কাছটা ভাঙিয়া যায়, বাড় বাঁধিয়া রাখিতে হয়। হাত সারিতে কিছুদিন লাগে। একটি সেবিকা এইবার দুইদিন মাত্র তাঁহার কাছে ছিলেন। তিনি বলেন, এই দুই দিন গোপালের মা কেবল স্বামী বিবেকানন্দের কথাই বলিয়াছিলেন। স্বামীজী কবে, কখন, কোথায় তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন এবং কি গল্প করিয়াছিলেন, সেই সকল কথাই বলিলেন। অন্য একজনকে গোপালের মা বলিয়াছিলেন, 'নরেনের দেহত্যাগের কথা শুনে আমার গাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো, মাথা ঘুরে গেল, মাটীতে পড়ে গেলাম। চোখে অন্ধকার দেখলুম। পড়ে গিয়ে হাতে খুব চোট লেগেছিল।'

অঘোরমণি স্বীয় কক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে থাকিতে দিতেন না, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে। দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকিলে তাঁহার গোপালদর্শনের ব্যাঘাত হইত। তিনি ত প্রকৃত কখনও একা বোধ করিতেন না। গোপাল তাঁহার সহিত দিবারাত্র থাকিতেন। অবশ্য অন্যে গোপালকে দেখিতে পাইত না। একবার বেলুড়মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ জনৈক শিষ্যের দ্বারা গোপালের মার জন্য কিছু তরকারী ও ফল কলিকাতা হইতে প্রেরণ করেন। ভক্তটি রাত্রিতে গোপালের মার কক্ষেই শয়ন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "শেষ রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। নূতন জায়গা, ভাল ঘুম হয়নি। শুন্‌ছি, একটা বায়নাধরা দুষ্ট ছেলেকে মা যেমন শাসন করে, উনি তেমনি কাহাকে কিছু বলছেন। মায়ে পোয়ে কথাবার্তা চলছে। ছেলে অন্ধকার থাকতেই গঙ্গায় ঝাঁপাইতে চাইছে। মা বলছেন, 'রোস্ বাবা, আলো হোক। কাক, কোকিল এখনও ডাকেনি। ফর্সা হোক, বাপধন আমার, তখন নাইবি।" ভক্তটি সকালে অঘোরমণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শেষ রাত্রিতে আপনি কার সঙ্গে কথা কইছিলেন? আপনার ঘরে ত আর কেউ থাকে না।' বেশ স্থির কণ্ঠে অঘোরমণি বলিলেন, 'জানিস না বুঝি তুই? গোপাল যে আমার কাছে থাকে।'

১৯০১ সালে গোপালের মার কঠিন রক্ত আমাশয় হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার এক যুবক শিষ্যকে অঘোরমণির সেবা-শুশ্রূষার জন্য একমাস কামারহাটীতে রাখেন। স্বামিজী একদিন নৌকা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। বেলুড় মঠের স্বামী প্রেমানন্দপ্রমুখ সাধুগণ তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইতেন। কখনো কখনো কলিকাতায় আসিয়া তিনি সারদামণি দেবীর কাছে দুই একদিন থাকিতেন। গোবিন্দ দত্তের গিন্নীর সহিত তিনি একবার অনেক দিন আগে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন,

প্রয়াগাদি কয়েকটি তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। প্রয়াগে চিরাচরিত প্রথামত একবার মুণ্ডিতা হন। কামারহাটীর বাগানে ভূতপ্রেতের উৎপাত ছিল। দত্তগিন্নীর আমলে রাত্রে লোক পাহারা থাকিত। পরে উহা উঠিয়া যায়। স্বামী সারদানন্দ নিজ ব্যয়ে আর একটি মালীর ব্যবস্থা করিয়া দেন। মালীটি ব্রাহ্মণীর শয়নঘরের পার্শ্বস্থ দালানে রাত্রে শুইয়া থাকিত। অঘোরমণির কক্ষে গোপালের জন্য একটি ছোট আসন-পীঁড়ি ছিল। অন্নব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া সাজাইয়া গোপালকে ডাকিতেন। একটি ছোট গেলাসে জল ও কাঁচ কলাপাতে ভাত-তরকারী নিবেদন করিতেন। ঘরের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ছবি ছিল। সেই ছবি এখন বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে আছে। অঘোরমণি খুব নিষ্ঠাবতী জাপিকা, সত্ত্বগুণী ও অন্তর্মুখী ছিলেন। দুপুরে ভাত খাইয়া পুকুরে গা ধুইতেন ও কাপড় ছাড়িতেন। বার মাস দুই বেলা গঙ্গাস্নান করিতেন। স্বীয় ঘরটি রোজ গঙ্গোদকে ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গোপালের মার শরীর অসুস্থ ও অপটু হইয়া পড়ে। তখন বেলুড় মঠের সাধুভক্তগণ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে তাঁহাকে আনিয়া রাখেন। ভগিনী নিবেদিতা গোপালের মার অদ্ভুত জীবনকথা শুনিয়া এতই মোহিতা হন যে, তাঁহাকে বাগবাজারস্থ নিজ ভবনে রাখিয়া সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিতা হন। গোপালের মাও নিবেদিতার আগ্রহে তথায় অবস্থান করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মানস কন্যা নিবেদতাও মাতৃনির্বিশেষে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত নিকটবর্তী কোন ব্রাহ্মণ পরিবারে করিয়া দেওয়া হইল। দিনে আহারের সময় গোপালের মা তথায় ঝোল ভাত খাইয়া আসিতেন এবং রাত্রে লুচি তরকারী প্রভৃতি উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের কেহ গোপালের মার ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেন। নিবেদিতার ছবিতে তাঁহার কণ্ঠে যে মালা শোভিত দেখা যায়, তাহা অঘোরমণির জপমালা। শেষ বয়সেও বৃদ্ধার মুখে বালিকার আনন্দ ছিল। গলার স্বর এত সুমিষ্ট ছিল যে, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নিরন্তর এক অসীম অতল আনন্দসাগরে তিনি ভাসিতেন, তাঁর নাক মুখ চোখ ফাটিয়া আনন্দ বিকীর্ণ হইত। তিনি খুব অল্পভাষিণী ছিলেন। বেলুড় মঠের সাধুভক্তগণ তাঁহার নিকট কখনও কিছু শুনিবার ইচ্ছা করিলে তিনি বলিতেন, 'আমি বাপু বোকা, হাবা। তোরা কথা বল। আমি শুনি।' কাহারও নিকট কিছু লইতে চাহিতেন না। কেহ কিছু দিতে চাহিলে বলিতেন, 'গোপাল আমার সব অভাব মিটিয়ে দিয়েছে।' অঘোরমণির অভাববোধ

মোটেই ছিল না। সাধিকা সিদ্ধাবস্থায় উপাস্যের পূর্ণ স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেষের দিকে আর 'আমি খাব', 'আমি শোব', 'আমি বেড়াব' বলিতে পারিতেন না। তাঁহার সমগ্র জীবন হরিময়, গোপালময় হইয়া গিয়াছিল। মুখ দিয়া তাই সহজভাবে বাহির হইত, 'গোপাল খাবে', 'গোপাল শোবে' ইত্যাদি। স্বহৃদয়ে তিনি সর্বদা গোপালকে দেখিতে পাইতেন। অন্তিম সময় সমাগত হইলে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে আনা হয়। তাঁহাকে তীরস্থ করিবার সময় নিবেদিতা পুষ্প, চন্দন, মাল্যাদি দ্বারা তাঁহার শয্যাদি স্বহস্তে সুন্দরভাবে ঢাকিয়া সাজাইয়া দেন, একদল কীর্তনীয়া আনয়ন করেন এবং স্বয়ং নগ্নপদে সাশ্রুনয়নে গঙ্গাতীর পর্যন্ত গমন করিয়া যে দুইদিন গোপালের মা জীবিতা ছিলেন সেই দুইদিন গঙ্গাতীরে রাত্রিযাপন করেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই, অথবা সন ১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ় ব্রাহ্ম মুহূর্তে উদীয়মান সূর্যের রক্তিম আভায় যখন পূর্বগগন রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল এবং নীলাম্বরতলে দুই একটি ক্ষীণপ্রভ তারকা ক্ষীণজ্যোতিঃ চক্ষুর ন্যায় পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিল, যখন শৈলসুতা ভাগীরথী জোয়ারপূর্ণা হইয়া, ধবল তরঙ্গে দুই কূল প্লাবিত করিয়া মৃদু মধুর নাদে প্রবাহিতা, সেই সময়ে গোপালের মার শরীর গঙ্গাজলে অর্ধনিমজ্জিত করা হইল।

অঘোরমণির জীবনের শেষ রাত্রির বর্ণনা ভগ্নী নিবেদিতা এইভাবে দিয়াছেন।* "সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আমরা মুমূর্ষু দেহের মন্থর ও কঠিন নিশ্বাসপ্রশ্বাস লক্ষ্য করিতেছিলাম। সুদীর্ঘ পূরক নিশ্বাস এত ধীরে ধীরে অন্তরে প্রবেশ করিতেছিল যে, মনে হইত, আর বুঝি জীর্ণ দেহে স্পন্দন আসিবে না। কিন্তু আবার রেচক নিঃশ্বাস হইত এবং তৎপরে পুনরায় দ্রুত গভীর কয়েকটি নিঃশ্বাস গ্রহণ চলিত। এইরূপ সুদীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ সাধারণতঃ দেখা যায় না। ইহা বহু বৎসর প্রাণায়াম অভ্যাসের ফল। এই বৃদ্ধা সাধিকা ত্রিশ বৎসর যাবৎ দিবারাত্রি তাঁহার ইষ্টদেবতা বালগোপালের নাম মালায় জপ করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে প্রাণায়ামে সিদ্ধা হইয়াছিলেন। যাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আমরা যাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলাম তিনি গোপালের মা। এই ভাগ্যবতী সাধিকাকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জননীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন।"

---

* মূল ইংরাজিটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (১৯০৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়) প্রকাশিত।

"বাসনামুক্ত, অভাবশূন্য হইয়া অঘোরমণি গঙ্গাতীরে অন্তিম শয়নে শায়িতা। গোপালের ধ্যানে নিমগ্না, মুখমণ্ডল দিব্য মাধুর্য্য ও প্রশান্তিতে উদ্ভাসিত। একদিন এবং একরাত্রি শোভাবাজারের রাজাদের গঙ্গাযাত্রার ঘাটে এইভাবে অতিবাহিত হইল। পূর্ণচন্দ্রের উদয়কালেই তাঁহাকে গৃহের বাহিরে আনা হয়। তখন তাঁহার মুক্ত আত্মা প্রথম বহিরাবরণ সগর্বে ত্যাগপূর্বক নীরবে ঊর্দ্ধলোকে উড্ডয়নোন্মুখ। কিন্তু যখন মুমূর্ষু সাধিকা গঙ্গাঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ও শীতল সমীরণে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন তখন তাঁহার নিষ্পন্দ শরীরে পুনর্জীবনের সঞ্চার দেখা গেল। নিঃশেষে নির্বাপিত হইবার পূর্বে তাঁহার প্রাণশিখা আরও অনেক ঘণ্টা ভগ্ন দেহ-প্রদীপে জ্বলিয়াছিল।"

"সম্ভবতঃ তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শায়িতা ছিলেন না। কারণ, কখনো কখনো পার্শ্বে উপবিষ্টা একের বা অপারর দিকে চোখ ফিরাইতেন। তখন তাঁহার চোখে চেনার চাহনি দেখা যাইত। শেষ প্রাতে যখন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া সাধিকার শিয়রে বসিয়া উপনিষদের শ্লোকাবলী পাঠ করিলেন তখন তিনি দৃশ্যতঃ যে ভাবে সাড়া দিলেন তাহাকে উদ্দীপনা বলা যায়। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ বিশুদ্ধ জীবন ঈশ্বরের সন্তানভাব সাধনায় কাটাইয়াছেন। এখন প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে পরিপক্ক বার্ধক্যে তাঁহার ভৌতিক দেহ শিশুত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন এবং মস্তকের পার্শ্বপরিবর্তন ব্যতীত প্রবৃদ্ধ দেহের আর কোন গতি ছিল না। মহাকবি সেক্সপিয়র সত্যই বলিয়াছেন যে, মানুষ বার্ধক্যে দ্বিতীয়বার শিশুত্ব প্রাপ্ত হয়। গত দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা শিশুর মতই ছিল। যতই শেষদিন সন্নিকট হইল ততই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান কমিতে এবং আন্তর্জ্ঞান বাড়িতে লাগিল। কিন্তু শেষ রজনীতে বহুঘণ্টা তাঁহার দেহ নিস্পন্দ এবং মন বহির্জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত, অন্তর্গত ও ধ্যানমগ্ন ছিল। মুমূর্ষু সাধিকার নীরবতায় প্রশান্তি যেন মূর্ত হইয়াছিল। বাহিরে ঘাটের সিঁড়িতে উত্তাল তরঙ্গমালা ধীরবেগে আঘাত করিতেছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টিঝড় সোঁ সোঁ শব্দে গঙ্গাবক্ষে পতিত হইয়া জলরাশিকে তরঙ্গায়িত করিতেছিল। মধ্যরাত্রিতে বা মধ্যরাত্রির ঘণ্টাখানেক পূর্বে বা পরে, গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নদীতে জোয়ারের শব্দ উঠিল। তখন চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন ও চতুর্দিক অন্ধকার। ছোট বড় অসংখ্য নৌকা গঙ্গাবক্ষে নঙ্গর ফেলিয়া বিশ্রামরত। হঠাৎ জোয়ারের বেগে নৌকাগুলি পরস্পর ধাক্কা খাইল। মাঝিদের

ঘুম ভাঙিল। তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বান আস্‌ছে! প্রয়াণোন্মুখ সাধিকা যাঁহাদের গুরু ও বন্ধু ছিলেন তাঁহাদের দীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দে মিলিয়া গেল। আবহাওয়ার ইঙ্গিতে তাঁহারা অন্তরে বুঝিলেন, ভাঁটার সময়ে সাধিকার প্রয়াণ ঘটিবে এবং তাঁহার গৃহস্থ স্বজন আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না।"

"ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল; তথাপি কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। যাঁহারা বিশ্রাম করিতেছিলেন, তাঁহারা উঠিয়া সাধিকার সামান্য সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। একজন সেবিকা একটু চোখ বুজিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। হঠাৎ কোমল হস্তের স্পর্শে জাগ্রতা হইলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন, 'বাহকদের ডাক। মহা-প্রয়াণ সমাগতা।' সিঁড়ির উপরে ঘাটের চাতালে তাঁহারা বসিয়া অতীতের গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। অতীতের সহিত বর্তমানের সংযোগ-সূত্ররূপ ছিলেন এই মুমূর্ষু ব্রাহ্মণী। ক্ষণকাল পরে মুমূর্ষু দেহ খাটে তোলা হইল। গেরুয়াধারী ও শ্বেতবস্ত্রপরিহিত বাহকগণের স্কন্ধে খাট উঠিল এবং ঘরের বাহিরে উত্তরদিকে বাহিত হইয়া জলের নিকটে রক্ষিত হইল যাহাতে গোপালে মা অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে রাখিয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন।"

"তথায় গোপালগত প্রাণ সাধিকা গঙ্গাপ্রাপ্তা রহিলেন। শেষ মুহূর্তে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিবর্তিত হইয়া নিয়মিতভাবে চলিল। সমবেত সন্ন্যাসিগণের মধ্যে স্বামী সারদানন্দকে গোপালের মা বাল্যকাল হইতেই জানিতেন। তিনি সাধিকার উপর ঝুঁকিয়া কাণের কাছে মুখ রাখিয়া মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেন, 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ! ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম!...।' হিন্দুমাত্রেই এই মহামন্ত্র মৃত্যুকালে শুনিতে ভালবাসেন। এক মুহূর্ত পরে সমবেত সকলের মুখে উচ্চারিত হইল 'হরি বোল!' অঘোরমণির শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হইল। তাঁহার মুক্ত আত্মা গোপাল-লোকে চলিয়া গেল। রক্তমাংসের দেহমাত্র অবশিষ্ট রহিল। খাটের শিয়রে উপবিষ্ট স্বামী সারদানন্দ মেঘের আড়ালে আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি ভোর হয়েছে?' খাটের পদপ্রান্তে উপবিষ্ট একজন উত্তর দিলেন, 'হাঁ, এখন ভোর!' আমরা গঙ্গার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, যে পুণ্য সলিলা মৃতার পদস্পর্শ করিতেছিল তাহা কয়েক ইঞ্চি নীচে সরিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম মুহূর্তে ভাঁটার আরম্ভে গোপালের মা মর্ত্যলোক ছাড়িয়া গোপাল-লোকে চলিলেন।" ব্রাহ্ম

মুহূর্তে অঘোরমণির পূত প্রাণপঞ্চ গোপালের অভয়পদে মিলিত হইল। তিনি অমর লোকে গমন করিলেন। মৃতদেহের মুখমণ্ডল অদৃষ্টপূর্ব সুষমায় ভরিয়া উঠিল। কাশীমিত্রের শ্মশানচুল্লীর মধ্যে চিতাগ্নি জ্বলিল। তাঁহার মৃত্যুকালে বেলুড় মঠের স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ এবং ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। আত্মীয়েরা কেহ নিকটে না থাকায় বেলুড় মঠের একটি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী গোপালের মার মৃতদেহের সৎকার করিয়া দ্বাদশ দিবস নিয়ম রক্ষা করিলেন। শোকসন্তপ্তা নিবেদিতা ঐ দ্বাদশ দিন গত হইলে গোপালের মার পরিচিতা কামারহাটীর অনেকগুলি স্ত্রীলোককে স্বীয় বিদ্যালয়গৃহে নিমন্ত্রণপূর্বক আনাইয়া কীর্তন ও উৎসবাদির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গোপালের মা বেলুড়মঠে ঠাকুরসেবার জন্য সঞ্চিত দুই শত টাকা দিয়াছিলেন। শরীরত্যাগের দশ বার বৎসর পূর্ব হইতে তিনি নিজেকে সন্ন্যাসিনী বলিয়া গণ্য করিতেন এবং সর্বদা গৈরিক বসনে পরিহিতা থাকিতেন।

ষষ্ঠ মণি

গোলাপসুন্দরী দেবী

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই। উত্তর কলিকাতার এক ভগ্ন জীর্ণ গৃহে এক শোকাতুরা ব্রাহ্মণী সমস্ত দিন উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাগমন হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর বাড়ী হইয়া এই বাড়ীতে আসিবেন। যতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর বাড়ীতে ছিলেন ততক্ষণ ব্রাহ্মণী ঘর বাহির করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন বিলম্বিত হওয়ায় তিনি ভাবিতেছিলেন, বোধ হয় ঠাকুর এই ভাগ্যহীনার গৃহে পদার্পণ করিবেন না। তাই তিনি নিজেই নন্দ বসুর বাড়ীতে খবর লইতে গেলেন, কেন ঠাকুরের এত দেরী হইতেছে। ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া পরমানন্দে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। তারপর কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। আনন্দের আতিশয্যে অধীর হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না গো! আমার মেয়ে চণ্ডী যখন (বিয়ের পর) এসেছিল সেপাই শান্ত্রী নিয়ে, আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল, তখনও এত আহ্লাদ হয় নি গো! ওগো চণ্ডীর শোক এখন আমার একটুও নাই! যাই, সকলকে বলিগে, আয়রে আমার সুখ দেখে যা! যাই যোগেনকে বলিগে, আমার ভাগ্যি দেখে যা। ওগো, এক মুটে লটারীতে একটা টাকা দিয়ে লাখ টাকা পেয়েছিল। সে যাই শুনলে, এক লাখ টাকা পেয়েছে, অম্‌নি আহ্লাদে মরে গিছ্‌লো! সত্য সত্যই মরে গিছ্‌লো! আমার যে তাই হলো গো! তোমরা সকলেই আশীর্বাদ কর, না হলে সত্য সত্যই আমি আনন্দে মরে যাবো।"*

ব্রাহ্মণীর এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাস হইতেছে। এমন সময় তাঁহার ভগ্নী আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, 'দিদি এসো না? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হয়? নীচে এসো। আমি কি একলা পারি?' ব্রাহ্মণী আনন্দে আত্মহারা।

---

* "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত", ৩য় ভাগ ১৯।১।২৩২—২৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার ভক্তদের তিনি একদৃষ্টে দেখছেন, তাঁদের ছেড়ে যেতে পাচ্ছেন না। এইরূপ কথাবার্তার পর ব্রাহ্মণী অতিশয় ভক্তি সহকারে ঠাকুরকে ভিতরে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিলেন। ভক্তগণকেও তিনি সযত্নে সানন্দে ফলমিষ্টি খাইতে দিলেন। রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তদের বলিলেন, 'এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহ্লাদ!' শ্রীম—'যিশু খ্রীষ্টের সময় ঠিক এই রকম একটা ঘটনা হয়েছিল। তারাও দুইটী ভগ্নী মার্থা ও মেরী খ্রীষ্টের পরম ভক্ত ছিলেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসুক হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাদের গল্পটী কি বলত? তখন শ্রীম* বাইবেলের এই গল্পটী বলিলেন। মার্থা ও মেরীর বাড়ীতে যিশু খ্রীষ্ট গিয়াছেন। মেরী স্বগৃহে মহাপুরুষ দর্শনে ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণা, চলৎশক্তি রহিতা! মার্থা খ্রীষ্টের জন্য আহারাদি প্রস্তুত করিতেছিলেন। তিনি যিশুর কাছে নালিশ করিলেন, 'প্রভু, দেখুন দেখি, দিদির কি অন্যায়? উনি আপনার কাছে চুপ করে বসে আছেন, আর আমি একলা সব আয়োজন কর্‌ছি।' তখন যিশু মার্থাকে বলিলেন, 'তোমার দিদিই ধন্য! কারণ, মানব জীবনের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভগবৎশক্তি তা মেরীর লাভ হয়েছে।' মেরীর ন্যায় উপরোক্ত শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর ভগবৎ ভক্তি লাভ হইয়াছিল। তাই ইনিও মহাপুরুষদর্শনে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া। এই ব্রাহ্মণীর নাম গোলাপসুন্দরী দেবী।

গোলাপসুন্দরীর সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। একটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভের পর তিনি বিধবা হন। ছেলেটি অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু তখনকার দিনের কৌলিন্য-প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া গোলাপসুন্দরী তাঁহার একমাত্র কন্যা চন্ডীকে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের সুবিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যানুরাগী সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বিবাহ দেন। কন্যাটি অতি সুন্দরী ও গুণবতী ছিল। সে একটি পুত্রের জননী হইয়া দেহত্যাগ করে। কন্যাকে দেখিয়া পুত্রহীনা মাতার পুত্রশোক কিঞ্চিৎ উপশম হইত। এখন কন্যাটীকে হারাইয়া গোলাপসুন্দরী পাগলিনীর মত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রতিবেশী ও সুহৃদ যোগেন্দ্রমোহিনী† শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতেন। সাধুর দর্শন

* 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

† যোগেন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস। ইনিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা ছিলেন। ইঁহার জীবনী এই পুস্তকে আছে।

ও সান্ত্বনা পাইলে শোক কতকটা কমিতে পারে মনে করিয়া যোগেন্দ্রমোহিনী তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে লইয়া যান। গোলাপসুন্দরী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট স্বীয় শোককাহিনী আবেগভরে বিবৃত করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনিয়া শোকাতুরা ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, 'তুমি ভাগ্যবতী। জগতে যার কেহ নাই ঈশ্বরই তার আপনার জন হইয়া থাকেন।'*

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন এবং তাঁহার কথামৃত পান করিয়া গোলাপসুন্দরীর শোকাবেগ হ্রাস পাইল। তাঁহার নিকট কয়েকবার যাইতেই ব্রাহ্মণী শোকমুক্তা হইলেন। ব্রাহ্মণীর ব্যাকুল প্রার্থনায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বাড়ীতে যান। ইহার বিবরণই প্রথমতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ঠাকুরের সহধর্মিণী সারদামণি দেবী তখন কালী মন্দিরের নহবতে থাকিতেন। সারদা দেবীর সহিত গোলাপসুন্দরীর পরিচয় করাইয়া দিয়া ঠাকুর স্বীয় সহধর্মিণীকে বলিলেন, 'তুমি ওকে খুব ঠেসে পেট ভরে খেতে দেবে। পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে।' তখন হইতেই গোলাপসুন্দরী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইলেই সারদামণির সহিত দেখা করিতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে নহবতে থাকিয়া যাইতেন। গোলাপসুন্দরী যখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থাকিতেন তখন প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিতেন। অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে সারদামণি ভাতের থালা সাজাইয়া দিতেন এবং গোলাপসুন্দরী থালাটী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতেন। গোলাপসুন্দরী একদিন ঠাকুরের সামনে ভাত তরকারীর থালাটি রাখিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন এবং ঠাকুর আহার করিতেছেন। তিনি দেখিলেন, 'খাবার সময় ঠাকুর যখনই মুখে গ্রাস দিচ্ছেন অমনি তাঁর ভেতর থেকে একটা যেন সাপের মত গ্রাসটী ছোবল মেরে নিয়ে খেয়ে ফেলছে।' তাহা দেখিয়া তিনি হাসিয়া আকুল! ঠাকুরও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি গো, বল দেখি, আমি খাচ্ছি না আর কেউ খাচ্ছে?' গোলাপসুন্দরী এতক্ষণ যা দেখিয়াছিলেন তাহাই ব্যক্ত করিলেন। ঠাকুর তাহা শুনিয়া মহাখুসী হইয়া বলিলেন, 'ঠিক বলেছ। তুমি বলে দেখতে পেয়েছ এবং বুঝতে পেরেছ।' ইহা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণীর খুব প্রশংসা করিলেন। শাস্ত্রে আছে, যে সাধকের সর্পাকার কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন তাঁহার আহার কুণ্ডলিনীর আহুতি গ্রহণমাত্র হয়। সাধনার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়া-

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩১ মাঘ সংখ্যায় স্বামী অরূপানন্দের প্রবন্ধ দেখুন।

ছিলেন। তাই আহারকালে তাহার কুণ্ডলিনী সর্পবৎ ছোবল মারিতেন। রামপ্রসাদ সত্যই বলিয়াছেন, 'আহার করি, মনে করি, আহুতি দিই শ্যামা মারে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণিকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি এই ব্রাহ্মণী মেয়েটীকে যত্ন কোরো। এই বরাবর তোমার সঙ্গে থাক্‌বে।' ঠাকুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। গোলাপসুন্দরী এখন হইতে ছায়ার ন্যায় সারদামণির সঙ্গে ছিলেন এবং প্রায় ছত্রিশ বৎসর তাঁহার সেবাধিকার লাভ করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ঠাকুরের শিষ্যা ও সারদামণির প্রধানা সেবিকারূপে এবং গোলাপ মা নামে সুপরিচিতা। ঠাকুর অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে একটী বাড়ীতে আসিলে গোলাপ মা কিছুদিন তাঁহার পথ্যাদি তৈয়ার করিয়াছিলেন। কাশীপুর বাগানবাটীতে ঠাকুর যখন ছিলেন তখনও গোলাপ মা সারদাদেবীর কাছে প্রায়ই থাকিতেন এবং ঠাকুরের পথ্যাদি প্রস্তুত করিতেন। ঠাকুরের অদর্শনের পর গোলাপ মা সারদাদেবীর সঙ্গে কাশী হইয়া বৃন্দাবনে যান এবং উভয়ে একত্রে প্রায় এক বৎসর তথায় কঠোর তপস্যা করেন। ইহার পরেও সারদাদেবী কাশী, পুরী, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে এবং কৈলোয়ার, কোঠার প্রভৃতি স্থানে যাইলে গোলাপ মা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। সারদাদেবী কলিকাতায় আসিলে ত কথাই নাই। গোলাপ মা কখন বা সারদাদেবীর সঙ্গে জয়রামবাটীতে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইয়া থাকিতেন। এমন কি, কোন ভক্ত-বাড়ী যাইতে হইলেও সারদাদেবী গোলাপ মাকে সঙ্গে লইতেন এবং বলিতেন, 'গোলাপ না গেলে কি আমি কোথাও যেতে পারি? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমার ভরসা।'

সারদামণিকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যভক্তগণ মা বলিয়া ডাকিতেন। গোলাপ মাও তাহাই করিতেন। ভক্তদের অবিবেচনা ও আবদার হইতে মাকে গোলাপ মাই রক্ষা করিতেন। একবার ভক্তগণ ভক্তির আতিশয্যে শ্রীশ্রীমাকে ঘরে বসাইয়া ধূপধুনা দিয়া স্তব ও পূজা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমা ঘর্মাক্ত হইয়াও সঙ্কোচে কিছু বলিতে পারিতে-ছিলেন না। গোলাপ মা তখন অন্য কাজে একটু ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আসিয়া দেখিয়াই বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তোমরা কি কাঠপাথরের ঠাকুর পেয়েছ?' এই বলিয়া ভক্তদিগকে ধমক্ দিয়া মাকে বাহিরে বাতাসে লইয়া আসিলেন। বাগবাজারে উদ্বোধন মঠ নির্মিত হইবার পূর্বে মা যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তাঁহার জন্য বাড়ী ভাড়া করা হইত। এইরূপে বেলুড়ে, বাগবাজারে এবং অন্যান্য যে সকল স্থানে মা ছিলেন গোলাপ মা সর্বত্রই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। মা এবং

তাঁহার ভক্তদের আহারাদির ব্যবস্থা করা ছিল গোলাপ মার জীবন-ব্রত। এক কথায় মায়ের ভক্ত-সংসারে তিনিই প্রধান গিন্নী ছিলেন। ভক্তগণ মাকে যখন প্রণাম করিতেন তখন গোলাপ মা তথায় উপস্থিত থাকিয়া মায়ের অনুচ্চ উচ্চারিত আশীর্বাণী এবং ভক্তদের কুশলাদি প্রশ্নের উত্তর তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতেন। কোথাও যাতায়াতকালে গাড়ীতে উঠিবার ও নামিবার সময় গোলাপ মা গুরুপত্নীকে হাতে ধরিয়া সাহায্য করিতেন। চলিবার সময় মা সলজ্জ বধূটীর মত গোলাপ মার আঁচলটী ধরিয়া চলিতেন।

জপধ্যানেও গোলাপ মার গভীর নিষ্ঠা ছিল। বাগবাজার উদ্বোধন মঠে তিনি যখন মার সঙ্গে ছিলেন তখন তিনি ভোর চারিটার পূর্বেই উঠিতেন, এবং শৌচাদি সমাপনান্তে নিজের ঘরে জপে বসিতেন। প্রায় তিন ঘণ্টা জপধ্যানান্তে তিনি ঠাকুর-ঘরে যাইয়া ঠাকুর ও মাকে প্রণামপূর্বক নীচে আসিয়া দৈনিক রান্নার ভাণ্ডার বাহির করিয়া দিয়া তরকারী কাটিতেন। প্রথম রান্নার মত খানিকটা তরকারী কাটিয়া তিনি মাকে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং ফিরিবার সময় তাঁর একটি ছোট পিতল কলসীতে ঠাকুরপূজার জন্য রোজ গঙ্গাজল আনিতেন। পুনরায় আসিয়া তিনি তরকারী কাটায় যোগীন মাকে সাহায্য করিতে এবং পরে পান সাজিতে বসিতেন। ইদানীংকালেও মাতৃধামে রোজ একশত খিলীর কম পানে চলিত না। বৃদ্ধ বয়সেও মাতৃসেবায় বা ভক্তসেবায় তাঁহার আলস্য দেখা যাইত না। অন্য কেহ করিতেছে না বলিয়া তিনি কখনো বিরক্তি বা অনুযোগ করিতেন না। ভক্ত ও ভগবানের সেবা করিয়া তিনি ধন্য হইতেন। নারায়ণবুদ্ধি ব্যতীত এরূপ সপ্রেম সেবা অসম্ভব।

ঠাকুরপূজা শেষ হইলে ফলমিষ্টাদি প্রসাদ মার জন্য একটি থালায় রাখিয়া পরে গোলাপ মা শাল পাতে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া প্রথমে ভক্তদিগকে, এবং শেষে ভৃত্যগণকে দিয়া আসিতেন। দুপুরে সকলের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজের আহারান্তে সামান্য একটু বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামান্তে বৈকালে মহাভারত, গীতাদি শাস্ত্র বা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। কোন দিন রাত্রির রান্নার জন্য আলু ছাড়াইতেন বা পানের জন্য সুপারী কুচাইয়া রাখিতেন। কোন দিন বা সাধুব্রহ্মচারীদের বালিশের খোল বা ছেঁড়া মশারি প্রভৃতি সেলাই করিয়া দিতেন। বেলা পড়িলে শ্রীশ্রীমা বা যোগীন মার কাছে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেন বা মালা জপ করিতেন। কদাচিৎ কখনও বা বলরাম বসুর বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন। সন্ধ্যায়

ঠাকুরঘরে আলো দেওয়া হইলে ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া একটু পরেই নিজের ঘরে যাইয়া জপধ্যানে বসিতেন এবং রাত প্রায় ৯টা ৯॥টা অবধি উহাতে মগ্ন থাকিতেন। তৎপরে ভক্তদের আনীত ফলমিষ্টি প্রভৃতি থাকিলে ঠাকুরের রাত্রির ভোগের জন্য সব ঠিক করিয়া দিয়া মা ও ভক্তদের আহারের সময়ে প্রসাদী ফলমিষ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা ও দেখাশুনা করিয়া তবে সেদিনকার মত তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন।

গোলাপ মার সাধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলিতেন, 'এই গোলাপ, যোগেন কত ধ্যান জপ করেছে। গোলাপ জপে সিদ্ধ।' এত সাধনানুরাগ সত্ত্বেও গোলাপ মা কখনও সেবায় অন্যমনস্ক হইতেন না। কে কোন্ জিনিষটি পাইল বা না পাইল, এসবও তাঁহার তীক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইত না। কেহ হয় ত কার্যানুরোধে সকাল সকাল বাহিরে গেছেন, সেদিন হয়ত ঠাকুরের ভোগে বিশেষ কিছু দ্রব্য ছিল। তিনি তার জন্য প্রসাদ ঠিক মনে করিয়া রাখিয়া দিতেন। সংসারে জননী স্বীয় সন্তানাদির জন্য মায়ায় যাহা করিয়া থাকেন, গোলাপ মা সাধুভক্তদের সেবায় নিঃস্বার্থ প্রেমে তাহাই করিতেন। সাধুদের মধ্যে কেহ হয়ত বিছানা, বালিশ, মশারি উদ্বোধন মঠে ফেলিয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন। গোলাপ মার চক্ষে পড়িলে তিনি সে সব গুছাইয়া রাখিতেন। অপরিষ্কার হইলে নিজেই সাবান দিয়া বা ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া কাচিয়া লইতেন। উদ্বোধন মঠের সাধুভক্তগণ এই জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতেন। গোলাপ মা যেন তাঁহাদের দিদিমা ছিলেন। ঠাকুর সেবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তিনি সময় মত আনাইয়া রাখিতেন। শালপাতা প্রভৃতি আনান, ভাঙ্গা বাসনাদি বদ্‌লি করিয়া নূতন বাসন বা অন্য কিছু কেনা, কমলালেবুর খোসা ও আখের ছোব্‌ড়া শুকাইয়া উনুন ধরাইবার জন্য রাখা প্রভৃতি কাজেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। শাকসব্‌জীর পরিত্যক্ত খোসা, পাতা এবং ভক্তদের উচ্ছিষ্টাদি রাস্তায় গরুকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন। উদ্বোধন মঠে কতকগুলি খরগোস, গিনিপিগ্ ছিল। পান সাজা হইয়া গেলে পানের বোঁটাগুলি তাহাদের খাইতে দিতেন। তিনি এরূপ করিতেন এইজন্য যে, তাহারা পানের বোঁটা খাইতে ভালবাসে, তিনি গিনিপিগ্ ভালবাসিতেন বলিয়া নহে। ভিখারী বৈষ্ণব আসিলে দু একটী পয়সা দিতে ভুলিতেন না, মাঝে মাঝে এক আধখানা কাপড়ও তাদের দিতেন। তাহারা জানিত, মা বলিয়া ডাক দিলেই উপর হইতে কিছু পড়িবে। পাথুরিয়াঘাটার দৌহিত্রের নিকট হইতে তিনি মাসিক দশ টাকা পাইতেন। উহার মধ্যে পাঁচ টাকা উদ্বোধন মঠে নিজের খোরাকীর জন্য দিতেন। বাকী টাকা কয়টি

দীনদুঃখীর সেবায় ব্যয়িত হইত। তাঁহার নিজের বিশেষ কিছু খরচ ছিল না। এক পাগ্‌লী আসিয়া মাঝে মাঝে হাঁক দিত, 'গোলাপ মা, আমি এইছি।' সে আসিলে গোলাপ মা তাহাকে কিছু খাইতে দিতেন। কোন কোন রাত্রে যখন সকলে শুইয়া পড়িয়াছেন, তখন পাগ্‌লী আসিয়া ডাকিত। সামনের দরজায় সাধুদের ধমক্ খাইয়া সে পিছনের দরজায় যাইয়া গোলাপ মাকে ডাকিত। ডাক শুনিয়া গোলাপ মা উঠিয়া বলিতেন, 'এত রাতে তোকে কি দিই?' পাগ্‌লীকে কিছু খাইতে দিয়া গোলাপ মা বলিতেন, 'আহা! পাগল, অনাথ, দুয়ারে দুয়ারে মেগে খায়। সময় হ'ক, অসময় হ'ক এলে এক মুঠো দিতে হয়।' এই জন্যই বোধ হয়, মাতাপিতা তাঁহাকে অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিতেন। অভাবে পড়িয়া কেহ কিছু চাহিলে গোলাপ মা ভিক্ষা করিয়াও তাহাকে কিছু দিতেন। কোন গরীব প্রতিবেশীর অসুখ হইলে ভক্ত ডাক্তারদের ডাকিয়া দেখাইতেন। এইভাবে যথাসাধ্য তিনি সকলের সেবা করিতেন। নিজে নেহাৎ অসমর্থ না হইলে কাহারও সেবা লইতে চাহিতেন না। কিন্তু কেহ একটু সেবা করিলে তাহা মনে রাখিতেন। এইভাবে গোলাপ মার সমগ্র জীবন সপ্রেম সেবায় অতিবাহিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া শোকমুক্ত হইবার পর হইতেই গোলাপ মা তাঁহার সমগ্র জীবন সাধনা ও সেবায় উৎসর্গ করেন। নিঃসন্তান বিধবা ব্রাহ্মণীর জীবনের সদ্ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে, তাহা গোলাপ মা দেখাইলেন।

গোলাপ মার আদৌ অভিমান ছিল না। তাঁহার জীবনে কখনো অভিমান দেখা যায় নাই। শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবাশুশ্রূষা করিবার সময় ভক্তদের কাছে কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু অভিমানভরে চলিয়া যান নাই। গোলাপ মা বলিতেন, "কি আশ্চর্য! সেই সময় ঠাকুরের কাছে আমার নামে কেহ কোন কথা লাগালে স্বপ্নে দেখতুম, ঠাকুর সে সব আমাকে বলে দিচ্ছেন। স্বপ্নে ঠাকুর আমাকে বলতেন, 'ওগো, তোমার নামে অমুক এ সব কথা বলেছে। তুমি বল, অমুক তোমায় ভালবাসে, সেও এ সব কথা বলেছে।' সমস্ত রাত্রি ঠাকুরকেই স্বপ্নে দেখতুম। লোকের ভালমন্দের কোন কথা কাণেও ঢুকত না।" সাধুব্রহ্মচারিগণ কখনও কখনও তাঁহাকে রুক্ষ কথা বলিয়া কাঁদাইতেন। তখন তাঁহার মনে ক্ষণিক অসন্তোষ আসিলেও, অসন্তুষ্ট ভাব বেশী সময় পোষণ করিতেন না। 'সতের রাগ জলের দাগ' এই শাস্ত্রবাক্যের জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন গোলাপ মা।

কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের কন্যা হইলেও আহারাদি সম্বন্ধে গোলাপ মার কোন

গোঁড়ামি বা শুচিবাই ছিল না। শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "গোলাপের মনে কোন বিকার নাই, দিলে হয়ত দোকানের খানিকটা আলুর দম খেয়ে!" শুচি-অশুচি বিচার মনের উচ্চ অবস্থায় থাকে না। গোলাপ মা সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী একদিন বলিতেছেন, "একদিন দেখি, গোলাপ দিদি তোমার ব্যবহৃত পায়খানাটি সাফ্ করে কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেলেন। আমি বললুম, ওকি গোলাপ দিদি! গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসো। গোলাপ দিদি বললেন, তোর ইচ্ছা হয়, তুই করগে যা না।" ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'গোলাপের মন কত শুদ্ধ, কত উচ্চ! তাই ওর শুচি-অশুচি অত নেই। ও অত শুচিবাইটাইয়ের ধার ধারে না। ওর ওই শেষ জন্ম। তোদের অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার।'

সাধক রামপ্রসাদের এই গানটি গাহিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করিতেন—

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
(তোর) দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥

গোলাপ মার এই উন্নত অবস্থা লাভ হয়েছিল। এটী জ্ঞানীর অবস্থা। শ্রীশ্রীমা আরও বলিয়াছিলেন, "এই গোলাপের মনটি খুব শুদ্ধ। বৃন্দাবনে মাধবজীর মন্দিরে আমরা ঠাকুর দর্শন করতে গেছি। সঙ্গে যোগানন্দ (স্বামী) এরা সব। কাদের ছেলেমেয়ে মন্দির নোংরা করে দিয়ে গেছে। সবাই নাক সিটকাচ্ছে, কিন্তু কেউ পরিষ্কারের চেষ্টা করছে না। তা দেখে গোলাপ অমনি নিজের নূতন মলমলের ধুতি ছিঁড়ে মন্দির পরিষ্কার করলে। মাগীগুলো দেখে বলছে, এ যখন ফেলছে তবে এরই ছেলে নোংরা করেছে রে! আমি মনে মনে বলছি, মাধব দেখ কি বলছে! কেউ বা বলছেন, এঁরা সাধু লোক। এঁদের আবার ছেলেপিলে কি? সবায়ের দেবদর্শনের অসুবিধা হচ্ছে বলে এঁরা ফেলছেন, মন্দিরে ময়লা রয়েছে এই জন্য। এই গঙ্গার ঘাটেই যদি কোন ময়লা দেখে ত গোলাপ হেথা সেথা থেকে ন্যাক্ড়া কুড়িয়ে এনে পরিষ্কার করে ঘটী ঘটী জল ঢেলে ধুয়ে দিলে! এতে দশ জনের সুবিধা হ'লো। তারা যে শান্তি পেলে তাতে গোলাপেরও মঙ্গল হবে। তাদের শান্তিতে এরও শান্তি হ'বে। অনেক সাধনভজন করলে, পূর্ব জন্মের বহু তপস্যা থাক্লে তবে মনটা এ জন্মে এত শুদ্ধ হয়।"

মা গঙ্গার প্রতি গোলাপ মার অগাধ ভক্তি ছিল। অতি বৃদ্ধ বয়সে অশক্ত

হইয়াও লাঠিভর দিয়া নিত্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য-শিষ্যাগণের গঙ্গাভক্তি অসাধারণ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি।' শিষ্য-শিষ্যাগণ গুরুবাক্যে অচল বিশ্বাস করিতেন। সারদাদেবীর দেহত্যাগের পর গোলাপ মা প্রায় চারি বৎসর জীবিতা ছিলেন। মায়ের অন্তর্ধ্যানে তাঁহার দেহ মন চিরতরে ভাঙ্গিয়া যায়। মায়ের চিরসান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। গোলাপ মা পূর্ব হইতেই স্ত্রীভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, 'যোগেন যাবে শুক্ল পক্ষে, আমি যাবো কৃষ্ণ পক্ষে।' সাধিকার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। ১৩৩১ সালের ৪ঠা পৌষ (১৯২৪ খ্রীঃ, ডিসেম্বর) কৃষ্ণাষ্টমীর অপরাহ্নে গোলাপ মা প্রায় ষাট বৎসর বয়সে উদ্বোধন মঠে মহাসমাধিতে দেহত্যাগ করেন।

সপ্তম মণি

এমা কাল্‌ভে

চিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৮৯৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ ভারত-বাণী প্রচার করিবার পর পাশ্চাত্ত্যের যে সকল মনীষী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন মাদাম এমা কাল্‌ভে তাঁহাদের অন্যতমা। উক্ত বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী গায়িকা তখন আমেরিকায় ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৯৩-৯৪ খ্রীঃ স্বামিজীর সহিত কাল্‌ভের প্রথম সাক্ষাৎ হয় চিকাগোতে। স্বামিজী যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যান এবং তথা হইতে ইউরোপে যাইয়া ১৯০০ খ্রীঃ আগষ্ট হইতে অক্টোবর পর্যন্ত প্যারিসে ধর্মেতিহাস মহাসভাতে যোগদানের জন্য অবস্থান করেন তখন কাল্‌ভে স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ফরাসী গায়িকা সংগীতেও যেমন, ধর্মে ও দর্শনেও তেমনই বিদুষী ছিলেন। রোমান্ ক্যাথলিকদের সম্বোধনসূচক বাক্য ব্যবহার করিয়া কাল্‌ভে স্বামিজীকে 'মঁ পিয়ার' (=Mon Pere=My Father=আমার পিতা) বলিয়া ডাকিতেন।

স্বামিজী তাঁহার 'পরিব্রাজক' পুস্তকে কাল্‌ভের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আমার সঙ্গের সংগী তিন জন।...তন্মধ্যে একজন ফরাসিনী বন্ধু জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভে। ফরাসী ভাষায় 'মিষ্টর' হচ্ছেন 'মসিয়', আর 'মিস্' হচ্ছেন 'মাদ্‌মোয়াজেল', 'জ'টা পূর্ব বাংলার 'জ'। মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠা গায়িকা, অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব হ'তে। মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন। ইনি ইজিপ্ট প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি এঁর অতিথি হ'য়ে। কাল্‌ভে যে শুধু সংগীতের চর্চা করেন তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম শাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়। ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে বহু পরিশ্রমে বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন! রাজা বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী। মাদাম মেলবা, মাদাম এমা এমস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকলে আছেন।

জাঁ দরজে, কি প্লাঁস প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়কগণও আছেন। এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন। কিন্তু কাল্‌ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত প্রতিভা! অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ! এ সব একত্র সংযোগে কাল্‌ভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! তাঁর শৈশবে অতি কঠিন দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট, যার সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করে কাল্‌ভের এই বিজয় লাভ। এই সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে!"

দক্ষিণ ফ্রান্সের এভেরণের অন্তর্গত ডেকাজেভিল গ্রামে ১৮৬৪ খৃঃ এমা কাল্‌ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার কর্মব্যপদেশে তাঁহাকে কয়েক বৎসর স্পেনে থাকিতে হয়। মাতৃভাষা ফরাসী হইলেও প্রথমে তিনি স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলিতে শিখেন। সাত আট বৎসর হইতে পনের ষোল বৎসর পর্যন্ত কনভেণ্ট স্কুলে এমা বিদ্যার্জন করেন। এই সময়ে একটী ঘটনা ঘটে যাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণে পথের বালুকণা ও বায়ু যখন উত্তপ্ত তখন এমা স্বীয় স্কুলের ছাত্রীদের সহিত রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটী পুরাতন ক্যাসল (প্রাসাদ) দেখিলেন। বালিকাগণ বিস্মিত নয়নে সূর্যকরোজ্জ্বল ক্যাসলের দিকে তাকাইলেন। সেদিন যেন ক্যাসলটী এমার চক্ষে কত সুন্দর দেখাইতেছিল। একটী সঙ্গিনীকে এমা বলিলেন, 'কে জানে? হয়ত এই ক্যাসলটী একদিন আমার হবে।' এমার দিকে সঙ্গিনীগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। তাহারা পরিহাস-পূর্বক বলিলেন, 'তোমার মত গরীব বালিকার পক্ষে এই সুবৃহৎ সুন্দর ক্যাসেলের অধিকারিণী হওয়া কল্পনামাত্র নহে কি?' এমাও স্বীয় ভাবনাটী কাল্পনিক মনে করিয়া বেড়াইয়া কনভেণ্টে ফিরিলেন। এই ক্যাসলের নাম কাব্রিয়ার। ইহা একাদশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত এবং একদা রাজবংশের বাসস্থান ছিল। এমার স্বতঃস্ফূর্ত ভবিষ্যদ্বাণী কালে সফল হইল। এমা ভবিষ্যতে গায়িকারূপে প্রভূত অর্থ অর্জন-পূর্বক এই প্রাসাদ ক্রয় এবং ইহাতে বাস করেন। ভবিষ্যতের পূর্বাভাস বাল্যেই পাওয়া যায়।

এমা শৈশব হইতেই সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও সঙ্গীতপ্রিয়া ছিলেন। সেইজন্য পিতামাতা প্যারিসে তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। ১৮৮২ খৃঃ এমা

আঠার বৎসর বয়সে ব্রাসেল্‌সে অপেরা গায়িকারূপে আবির্ভূতা হন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি প্যারিসেই গান করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ লন্ডনে যাইয়া কভেন্ট গার্ডেন এবং বিজেট অপেরাতে গান ও অভিনয়াদি দ্বারা প্রসিদ্ধা হন। বিজেট অপেরাতে কারমেনরূপে তাঁহার অদ্ভুত অভিনয় নাট্য সাহিত্যে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এইবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে তিনি আমেরিকায় যাইয়া নিউইয়র্ক সহরের মেট্রোপলিটান এবং মানহাট্টান অপেরাতে গান করেন। সেই বৎসর চিকাগোতে ধর্মমহাসভা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে সুসভ্য শিক্ষিত জগতের বিশিষ্ট নরনারীগণ চিকাগোতে সমবেত ছিলেন। এমা কাল্‌ভে চিকাগো সহরে সংগীত করিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচিতা হন। কাল্‌ভে তাঁহার আত্মজীবনীর* সমগ্র দ্বাবিংশ অধ্যায়ে স্বামীজীর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়টীর নাম 'বৈদান্তিক সন্ন্যাসী।' এই অধ্যায়ে স্বামিজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ এইভাবে বিবৃত আছে।—

"আমার পরম সৌভাগ্য এবং চরম আনন্দ যে, এমন একটী মানুষের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল যিনি সত্যই ঈশ্বরের সহিত বিচরণ করিতেন, যিনি একাধারে মহৎ, তাপস, দার্শনিক এবং প্রকৃত মানবমিত্র ছিলেন। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব সুগভীর। তিনি আমার সম্মুখে নূতন জগৎ উন্মুক্ত করিলেন, আমার ধর্মভাব ও ধর্মজীবনকে বিস্তৃত ও সজীব করিলেন, সত্যের বৃহত্তর বোধে আমাকে দীক্ষা দিলেন। আমার আত্মা তাঁহার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। এই অসাধারণ পুরুষ বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের হিন্দু সন্ন্যাসী। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার উদার ধর্মশিক্ষার জন্য তিনি আমেরিকায় ব্যাপকভাবে বিদিত। আমি যখন চিকাগোতে যাই তিনি তখন তথায় বক্তৃতা দিতেছিলেন। আমি তখন ভীষণ মানসিক ও দৈহিক অবসাদে অভিভূত ছিলাম। আমার কয়েকটী বন্ধু তাঁহার শিক্ষায় উপকৃত হইয়াছেন দেখিয়া আমি তাঁহার কাছে যাইবার জন্য মনস্থ করিলাম।"

---

*ইহা ফরাসীতে লিখিত এবং রোসামন্ড গিল্‌ভার কর্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত। বইখানির নাম My Life

মাদাম কাল্‌ভের সঙ্গে স্বামিজীর সাক্ষাতের তারিখ ও সময় নির্ধারিত হইল। কাল্‌ভে স্বামিজীর গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তাঁহার বৈঠকখানায় লইয়া যাওয়া হইল। যাইবার পূর্বে বন্ধুগণ কাল্‌ভেকে বলিলেন, 'স্বামিজী কিছু জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তুমি তাঁর সহিত কথা বলিও না।' কাল্‌ভে বৈঠকখানায় ঢুকিয়া স্বামিজীর সম্মুখে ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। স্বামিজী ধ্যানমগ্নভাবে উপবিষ্ট, তাঁহার গৈরিক আলখাল্লা ঋজুরেখায় ভূমিতে লম্বিত, তাঁহার মস্তকে পাগ্‌ড়ী, দেহ সম্মুখে আনত এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় ভূমিবদ্ধ। উভয়ে কিছুক্ষণ নির্বাক্‌, নিস্তব্ধ। স্বামিজী কাল্‌ভের দিকে না তাকাইয়াই বলিলেন, 'বৎস, তোমার চারিদিকে কি যন্ত্রণাদায়ক পরিবেশ! শান্ত হও। এটি বিশেষ আবশ্যক!' কাল্‌ভে বলেন, 'তারপর শান্ত সুস্বরে, অবিচলিত উদাসীনভাবে তিনি আমার গুপ্ত সমস্যাগুলি এবং উদ্বেগসমূহ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। অথচ তিনি তখন পর্যন্ত আমার নামটিও জানিতেন না! নিকটতম বন্ধুবান্ধবীগণেরও নিকট আমার জীবনের যে সকল ঘটনা অবিদিত ছিল, সেইগুলি বলিয়া তিনি আমাকে স্নেহে সান্ত্বনা দিলেন। ইহা আমার নিকট অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য্য মনে হইল।'

মাদাম কাল্‌ভে বিস্মিতা হইয়া স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই সকল কিরূপে জানিলেন? কে আপনাকে আমার কথা বলিল?" স্বামিজী নীরব হাস্যে তাঁহার দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন কাল্‌ভে সরলা বালিকার মত নির্বোধ প্রশ্ন করিয়াছে! তারপর তিনি ধীরভাবে উত্তর দিলেন, 'কেহই তোমার কথা আমাকে বলে নাই, মা। তুমি কি মনে কর, ইহা আবশ্যক? যেমন একটি উন্মুক্ত পুস্তক পড়ি, তেমনি তোমার মনটিও পড়িলাম।' এইরূপ কিছুক্ষণ কাথাবার্তা চলিল। শেষে কাল্‌ভের ফিরিবার সময় আসিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন স্বামিজী বলিলেন, 'তুমি ঐ সব চিরতরে ভুলিয়া যাও। আবার প্রফুল্ল ও সুখী হও। তোমার স্বাস্থ্যটি পুনরায় গঠন কর। নির্জনে আর স্বীয় দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবিও না। মনের ভাবাবেগগুলির কোনও বাহ্যিক প্রকাশে রূপান্তরিত কর। তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ইহাই প্রয়োজন। তোমার সঙ্গীতসাধনার জন্যও ইহা আবশ্যক।'

স্বামিজীর সহিত এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাদাম কাল্‌ভে বলেন, 'আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম। তাঁহার বাক্য ও ব্যক্তিত্ব আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত

করিল। তিনি আমার মস্তিষ্ক হইতে জবরতুল্য জটিলতাসমূহ সরাইয়া তথায় তাঁহার স্বচ্ছ শান্ত চিন্তারাশি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে পুনরায় আমি প্রহৃষ্ট ও প্রফুল্ল হইলাম। তিনি যাদুকরদের মত কোন প্রকার সম্মোহিনী শক্তি আমার উপর প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার চরিত্রের বল, তাঁহার উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও গভীরতা আমার আত্মবিশ্বাস পুনরানয়ন করিল। যখন তাঁহাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিলাম তখন জানিলাম, তিনি অপরের বিশৃঙ্খল ভাবরাশিকে ইচ্ছামাত্র সুশৃঙ্খল শান্তিপ্রদ অবস্থায় পরিণত করিতে পারিতেন। লোকের চঞ্চল বিষণ্ণ মনকে সুশান্ত ও প্রফুল্ল করিবার অসাধারণ শক্তি তাঁহার ছিল। যিশুখ্রীষ্ট বা বুদ্ধদেবের মত তিনি উপাখ্যান বর্ণনপ্রসঙ্গে উপদেশ দিতেন। প্রশ্নোত্তর দিবার এবং আলোচ্য বিষয় সহজবোধ্য করিবার সময় তিনি সংস্কৃত শ্লোক সুকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেন। একদিন আমরা আত্মার অমরত্ব বা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। পুনর্জন্মবাদ তাঁহার ধর্মশিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ।"

স্বামিজী যখন পুনর্জন্মবাদ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন মাদাম কাল্‌ভে বলিয়া উঠিলেন, "আমি এই ভাবটি আদৌ গ্রহণ করিতে পারি না। আমার ব্যক্তিত্ব যতই তুচ্ছ হউক না কেন, আমি তাহা ধরিয়া রাখিতে চাই। আমি সনাতন সত্ত্বায় আমার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চাই না। এই ভাবটি আমার নিকট ভয়ঙ্কর।" স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "একদা এক বিন্দু জল বিশাল সমুদ্রে পতিত হয়। বারি-বিন্দুটি সাগরমধ্যে পড়িয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল, যেমন তোমরা করিতেছ। মহাসাগর উচ্চহাস্যপূর্বক ক্ষুদ্র জলবিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কাঁদিতেছ কেন বুঝতে পারি না। যখন তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হও তুমি অন্যান্য বারিবিন্দু-রাশিরূপ তোমার সকল ভাইবোনের সঙ্গে সংযুক্ত হও। আমি এই সকল বারিবিন্দু-রাশির দ্বারা নির্মিত। আমাতে মিলিত হইলে তুমি সাগর-স্বরূপতা প্রাপ্ত হও। তোমার ক্ষুদ্ররূপ বিশাল আকার ধারণ করে। যদি তুমি আমাকে ত্যাগ কর তাহা হইলে তুমি অচিরে সূর্যরশ্মির দ্বারা বিশুষ্ক ও বাহিত হইয়া আকাশচারী মেঘে পরিণত হইবে। তথা হইতে তুমি জলবিন্দুর আকারে অবতরণ করিবে পিপাসার্ত পৃথিবীতে আশীষরূপে।"

১৯০১ খৃীঃ স্বামী বিবেকানন্দ মাদাম কাল্‌ভের সহিত প্যারিস হইতে তুর্কী, গ্রীস ও মিশর প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ করেন। সঙ্গে ছিলেন বোষ্টনের পাদ্রী

হিয়াসিন্থ লয়সন ও তাঁহার স্ত্রী, এবং চিকাগোর কুমারী জোসেফাইন ম্যাকলিয়ড। এই দেশভ্রমণের কথা কাল্‌ভে তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন; 'কী তীর্থযাত্রাই না উহা হইয়াছিল? বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাসের কোন রহস্য স্বামিজীর অজ্ঞাত ছিল না। আমার চারি পার্শ্বে যে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হইত আমি উৎকর্ণ হইয়া সে সব শুনিতাম। আমি তাঁহাদের যুক্তিতর্কে যোগদানের চেষ্টা করিতাম না! আমার অভ্যাসানুসারে সকল উপলক্ষে আমি গান গাহিতাম। প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক ও পণ্ডিত পাদ্রী লয়সনের সঙ্গে স্বামিজী সকল প্রকার প্রশ্ন আলোচনা করিতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গির্জাসংসদের তারিখ এবং দলিলের যথার্থ মূল বিবরণটি পর্যন্ত তিনি বলিয়া দিতেন। লয়সন পাদ্রী হইয়াও সেই সকল বিষয় এত বিশদভাবে জানিতেন না।"

মাদাম কাল্‌ভে একদিন স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এই সকল সংবাদ জানিলেন কিরূপে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'গত দশ হাজার বৎসর যাবৎ আমাদের বেদের শেষাংশ উপনিষদগুলি পুরুষানুক্রমে মুনি-ঋষিগণ কর্তৃক লিখিত। সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত, অধ্যয়ন, অনুভূতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানিগণ কর্তৃক পুস্তকটী আলোচিত ও সংশোধিত হয়। কখনো কাহারো গ্রন্থের একটী বাক্য বা একটী পৃষ্ঠা মাত্র গৃহীত হয়। কদাচিৎ বা কাহারো সমগ্র পুস্তক রক্ষিত এবং উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রাগার সুবিশাল, সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা সুবৃহৎ। আমার সব জ্ঞান শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত।' গ্রীসে তাঁহারা এলিউসিস পরিদর্শন করেন। স্বামিজী কাল্‌ভেপ্রমুখ সঙ্গিগণকে ইহার রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন এবং এক বেদী হইতে অন্য বেদীতে, মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে তাঁহাদিগকে লইয়া যান এবং প্রত্যেক স্থানে যে শোভাযাত্রা হইত তাহার বর্ণনা দিয়া, ইহাদের প্রাচীন প্রার্থনা-সমূহ সুরযোগে গাহিয়া এবং পুরোহিতের অনুষ্ঠানগুলি দেখাইয়া বেড়ান।

এই সম্বন্ধে মাদাম কাল্‌ভে তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন।—"পরে মিশরে এক অবিস্মরণীয় রাত্রিতে নিস্তব্ধ স্ফিংসের ছায়ায় প্রাণমাতান রহস্যপূর্ণ বাক্যে স্বামিজী সুদূর অতীতে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। অতি সাধারণ সহজ অবস্থাতেও স্বামিজী ছিলেন অসামান্য ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি। তাঁহার মনোহর বাক্যে তিনি সকলকে মুগ্ধ করিতেন। বহুবার আমরা ষ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে স্থিরভাবে

বসিয়া বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে কালাত্যয় ভুলিয়া যাইয়া ট্রেন ধরিতে পারি নাই। এমন কি, কুমারী ম্যাক্লিয়ড, যিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সতর্ক ছিলেন, যাত্রার নির্দিষ্ট সময় ভুলিয়া যাইতেন। আমরা ইহার ফলে গন্তব্য স্থল হইতে অনেক দূরে অতিশয় অসুবিধাজনক সময়ে ও স্থানে আবদ্ধ হইতাম।"

"একদিন আমরা কাইরোতে পথ হারাই। মনে হয়, আমরা নানা প্রসঙ্গে প্রমত্ত ছিলাম। সে যাহা হউক, আমরা এক ময়লাপূর্ণ দুর্গন্ধময় রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। তথায় অর্ধ উলঙ্গ রমণীগণ জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিতে এবং দরজায় ঘোরাফেরা করিতেছিল। স্বামিজীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বিশেষতঃ চীৎকাররত একদল রমণী এক ভগ্ন গৃহের ছায়ায় বেঞ্চের উপর বসিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে ও ডাকিতে লাগিল। আমাদের এক সঙ্গিনী আমাদিগকে অগ্রে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। স্বামিজী স্বীয় দল হইতে নিজেকে ভদ্রভাবে ছিন্ন করিয়া বেঞ্চে উপবিষ্ট নারীগণের সমীপবর্তী হইয়া বলিলেন, 'হতভাগ্য রমণীগণ! হতভাগ্য প্রাণিগণ! এরা দৈহিক সৌন্দর্য্যকে দেবত্ব জ্ঞান করে। এদের দুরবস্থা দেখ!' ব্যভিচারাসক্ত রমণীর জন্য যিশু যেমন কাঁদিতেন, তেমনি স্বামিজী সেই পতিতাদের জন্য করুণার্দ্র চিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন। মুহূর্ত মধ্যেই রমণীগণ নির্বাক ও লজ্জিত হইল। তন্মধ্যে একজন সামনের দিকে ঝুঁকিয়া স্বামিজীর গৈরিক বস্ত্রাঞ্চল চুম্বনপূর্বক ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশ ভাষায় বলিল 'Hombre de dios, Hombre de dios' (হম্‌রে ডি ডিয়স্ = A man of God = ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ)। অপর এক রমণী হঠাৎ নম্রতামূলক ভীতিসূচক অঙ্গভঙ্গী করিয়া বাহু দ্বারা স্বীয় মুখ ঢাকিল স্বামিজীর অন্তর্ভেদী নয়নযুগল হইতে নিজের সঙ্কুচিত, কলুষিত ভীত আত্মাকে আড়াল করিবার জন্য।"

মিশর হইতে কাল্‌ভেপ্রমুখ সঙ্গিনী ও সঙ্গীদের ছাড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ইহার প্রায় এক বৎসর পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। সুতরাং কাল্‌ভের সহিত স্বামিজীর আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু, কাল্‌ভে স্বামিজীকে কখনো ভুলিতে পারেন নাই। তিনি নিজেকে স্বামিজীর কন্যা বা শিষ্যা জ্ঞান করিতেন। স্বামিজী এই গন্ধর্বসমা গায়িকার জীবনে যে দিব্য দীপ প্রজ্বলিত করেন তাহার ফলে কাল্‌ভের জীবন আলোকিত ও আধ্যাত্মিক হইয়া উঠে। ১৯১০ খ্রীঃ মার্চ মাসে কাল্‌ভে অষ্ট্রেলিয়ায় গান গাহিতে

যান এবং উক্ত মহাদেশ হইতে ফিরিবার পথে ভারতে ভ্রমণ করেন। ভারতে মাদ্রাজ, কলিকাতা, দার্জিলিং, দিল্লী, আগ্রা ও বোম্বাই প্রভৃতি সহরে তিনি গান গাহিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি বেলুড় মঠ পরিদর্শনে গমন করেন ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দের শীতকালে। তখন কলিকাতার 'ইংলিশম্যান্' পত্রিকার প্রতিনিধিকে কাল্‌ভে বলিয়াছিলেন, 'এতদিন ভারতকে আমি জগতের এক শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্ররূপে মনে করেছি। তাই তীর্থযাত্রীরূপে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানের জন্য আমি ভারতে এসেছি। ভারতকে আমি স্বপ্নরাজ্যের মত সুন্দর এবং স্বর্গরাজ্যের মত পবিত্র মনে করি।' প্রতিনিধি—'ভারত সম্বন্ধে আপনার এই গভীর শ্রদ্ধা, এত উচ্চ ধারণা কিরূপে হলো?' কাল্‌ভে—'স্বামী বিবেকানন্দের নিকট থেকে। তাঁর মুখে যখন প্রাচীন ভারতের মহোজ্জ্বল বর্ণনা শুনতাম তখন থেকে এই পবিত্র ভূমিকে দেখবার ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। ভগবানের কৃপায় আমার সেই ইচ্ছা এখন পূর্ণ হওয়ায় আমি পরমানন্দিতা।'*

'ইংলিশম্যান্' পত্রিকায় কাল্‌ভের আগমন-বার্ত্তা পড়িয়া কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ† এবং ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ সভ্যগণ গ্র্যান্ড হোটেলে কাল্‌ভেকে সম্বর্ধনা করিতে যান। সংবাদ পাঠাইবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দর্শনপ্রার্থীদের ডাক আসিল। প্রাসাদোপম হোটেলের দ্বিতলে এক সুসজ্জিত কক্ষে বিবেকানন্দ সমিতির সম্পাদক ও একটি সভ্য প্রবেশ করিলেন। এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "আপনারা এসেছেন শুনে মাদাম বড় আনন্দিতা হয়েছেন। তিনি আপনাদিগকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছেন।" পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত না হইতেই কাল্‌ভে দুইটি ভদ্রলোকের সহিত প্রতীক্ষারতগণের সম্মুখে হাস্যমুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ণবাবু যখন সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন তখন তাঁহাদের অভিবাদনপূর্বক ওষ্ঠে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া বলিলেন, 'নথ ইংলিশ'। পরে তাঁহার সঙ্গী ভদ্র লোকটিকে ফরাসী ভাষায় কিছু জানাইলেন। তখন সেই ভদ্রলোকটি পূর্ণ বাবুদের বলিলেন, 'মাদাম ইংরাজী জানেন না। সেইজন্য তিনি

* 'বিচিত্রা' মাসিকের ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীকুমুদবন্ধু সেনের প্রবন্ধ দেখুন।
† শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার।

অত্যন্ত দুঃখ বোধ কচ্ছেন। তাঁহার মনোভাব তিনি আপনাদের নিকট আপনাদের বিদিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না। আমি দোভাষীর কাজ করবো।'

প্রথমে পূর্ণবাবু বিবেকানন্দ সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ফটো দুইটি মাদামকে উপহার দিলেন। মাদাম সহাস্য বদনে সেইগুলি স্বহস্তে গ্রহণপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোটি অতি শ্রদ্ধাভরে মাথায় ঠেকাইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। কিন্তু, স্বামী বিবেকানন্দের ফটোটি দেখিয়া তিনি মহানন্দে অধীর হইলেন এবং ফটোটি বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তখন তাঁহার চোখ মুখ আনন্দোচ্ছ্বাসে উদ্দীপিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে, রুদ্ধ কণ্ঠে ভাঙ্গা ইংরাজীতে তিনি বলিলেন, Oh! I am very very happy! (আহা! আমি খুব সুখী হয়েছি)। তারপর তিনি পূর্ণবাবুর দিকে তাকাইয়া ফরাসী ভাষায় অনর্গল বলিতে লাগিলেন স্বামিজীর সম্বন্ধে। দোভাষী মাদামের ভাবোচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া শ্রদ্ধানত হৃদয়ে বলিলেন, 'মাদাম ভাবে বড় অভিভূত হয়ে পড়েছেন। স্বামিজী সম্বন্ধে তার পুরাণ সব স্মৃতি জেগে উঠেছে। এই ফটো দেখে মাদাম স্বামিজীকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।' দোভাষীর কথা শেষ হইতে না হইতেই মাদাম পুনরায় অনর্গল ফরাসী ভাষায় স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখনও তিনি স্বামিজীর ফটোটি বুকে চাপিয়া রাখিয়াছেন। দোভাষী স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান। তখন কাল্‌ভে নিজেই মনের আবেগ ভাঙ্গা ইংরাজীতে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।—'স্বামী বিবেকানন্দ যিশু খ্রীষ্টের মত মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি যিশুর মত সরল, প্রেমিক ও পবিত্র ছিলেন।' ইত্যাদি।

ইংরাজীতে ভাবপ্রকাশ ভাল হইতেছিল না বলিয়া তিনি পুনরায় ফরাসীতে বলিতে লাগিলেন। দোভাষী বলিলেন, "মাদাম বলছেন যে, তাঁর জীবনের এক সংকট-সময়ে তিনি স্বামিজীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। 'স্বামী বিবেকানন্দ পাঁচ বৎসরের শিশুর মত পবিত্র ছিলেন। তাঁর পূত সংসর্গে মানুষ পবিত্র হত। ভগবৎশক্তির প্রকাশমূর্তি ছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর কি প্রবল আকর্ষণ ছিল! সেরূপ অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণ আমি জীবনে অন্য কারো জন্য অনুভব করি নি। কতদিন তাঁর কথা শুনতে শুনতে এত তন্ময় হয়ে গেছি যে, স্পেশাল ট্রেণ এল, চলে গেল, বুঝতেই পারি নি! তাঁর পবিত্র সঙ্গের জন্য শুধু একবার নয়, বহুবার আমাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। কিন্তু, পরমানন্দে দিয়েছি। তাঁর কি বিশাল প্রেমপূর্ণ হৃদয়! কি অদ্ভুত পবিত্রতা! কি

মোহন আকর্ষণ! কি মর্মস্পর্শী বাণী! কি বালসুলভ সরলতা! কি উন্নত উদার চরিত্র! কি অপূর্ব তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি! কি সুন্দর বিশাল আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু!" দোভাষীর চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। মাদাম আবার ফরাসী ভাষায় তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতা ও আনন্দের আবেগ জানাইলেন। যদিও ভাষা পূর্ণবাবুদের অবোধ্য, তথাপি মাদামের হৃদয়াবেগ ও অব্যক্ত ভাবরাশি তাঁহাদের অন্তর স্পর্শ করিল। ভাবপ্রবাহের কলধ্বনি অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ধ্বনিত হইল। স্বামিজীর তেজোদৃপ্ত শিবতুল্য দিব্য মূর্তি সকলের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সেই বিলাস-কক্ষ শ্রদ্ধা ও পূজার স্বর্গীয় পরিবেশে পূর্ণ হইল।

অবশেষে পূর্ণবাবু দোভাষীর মারফৎ মাদামকে জানাইলেন, 'আপনি যদি স্বামিজী-প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে আমরা আপনার সুবিধামত সকল ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছি।' তদুত্তরে মাদাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামিজীর সমাধি-স্থান কোথায়?' বেলুড় মঠে স্বামিজীর সমাধি-স্থান অবস্থিত জানিয়া তথায় যাইবার জন্য কাল্‌ভে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। পরদিন বৈকালে তাঁহার বেলুড় মঠ যাওয়া স্থির হইল। সেইজন্য বিবেকানন্দ সমিতির একজন সভ্যকে পথপ্রদর্শকরূপে তখন আসিবার জন্য তিনি বলিলেন। পূর্ণবাবুরা মাদামের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন। দোভাষী তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া করমর্দনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গ্র্যান্ড হোটেল হইতে বেলুড় মঠ কত দূরে, তথায় ট্যাক্সি যায় কিনা এবং সময় কত লাগিবে।' ডাক্তার কাঞ্জিলাল হোটেল হইতে উদ্বোধন মঠে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের নিকট কাল্‌ভের বেলুড় মঠ দর্শনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং অবিলম্বে বেলুড় মঠে খবর পাঠাইলেন। প্রসিদ্ধ বংশীবাদক হাবু দত্তকে সংবাদ পাঠান হইল পরদিন বৈকালে বেলুড় মঠে যাইবার জন্য। বিবেকানন্দ সমিতির প্রতিনিধি পরদিন বৈকাল আড়াইটার সময় গ্র্যান্ড হোটেলে উপস্থিত হইলেন। কাল্‌ভের দোভাষী তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গেলেন। মাদাম মাথা নত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানাইলেন। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আরো কতকগুলি সাহেবমেম সেই কক্ষে আসিলেন। দুইখানা ট্যাক্সিতে মাদাম কাল্‌ভে সঙ্গিনীদের সহিত বেলুড় মঠ দর্শনে যাত্রা করিলেন। একটি ট্যাক্সিতে কাল্‌ভের সঙ্গে পথপ্রদর্শক এবং দুইটি ফরাসী মহিলা বসিলেন। মহিলাদ্বয় ফরাসীতে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। কিন্তু, কাল্‌ভে ছিলেন

ধীর, স্থির, গম্ভীর। ট্যাক্সি ধীরে ধীরে বেলুড় মঠে প্রবেশ করিল। মঠের স্বামিজীগণ এবং ভক্তগণ কাল্‌ভেকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকালে কাল্‌ভের সহিত স্বামী সারদানন্দের পরিচয় হইয়াছিল। তাই স্বামী সারদানন্দ প্রথমে আসিয়া মাদামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন?' তিনি কাল্‌ভের সহিত কথা বলিতে বলিতে তাঁহাকে মঠ দেখাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সেই দোভাষী। অপর সাহেবমেমগণ মাদামের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিলেন। মাদাম সর্বাগ্রে স্বামিজীর সমাধি-স্থান দেখিতে চাহিলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে লইয়া যাইয়া বলিলেন, 'এই স্থান'। কাল্‌ভে পরম ভক্তি সহকারে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অপর সাহেবমেমগণ তাঁহার সঙ্গে প্রবেশপূর্বক পাঁচ মিনিট পরে বাহিরে আসিলেন। কিন্তু, মাদাম ভিতরে রহিলেন। তিনি স্বামিজীর প্রস্তরমূর্তির সম্মুখে যুক্তকর ও নতজানু! সকলেই নীরব, গম্ভীর। ভাবপূর্ণ গাম্ভীর্যের নিবিড়তায় স্থানটি পরিপূর্ণ হইল। পার্শ্বে পূতসলিলা কলনাদিনী জাহ্নবী গম্ভীরনাদে প্রবাহিতা। গঙ্গার গাম্ভীর্য সমাধি-মন্দিরের গাম্ভীর্যকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে পনের মিনিট কাটিয়া গেল। নতজানু, ধ্যানমগ্না সাধিকার চোখে প্রেমাশ্রু, মুখে গণ্ডে প্রেমপুলক। কি মহান্ দিব্য দৃশ্য! স্বর্গগত সন্ন্যাসীর মর্ম্মর মূর্তির চরণ-প্রান্তে জগৎপ্রসিদ্ধা ফরাসী গায়িকা নীরবে অশ্রুঅর্ঘ্য দান করিলেন।

পরে মাদাম ধীরে ধীরে মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। তিনি তখনও নীরব, ভাবগম্ভীর। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদিগকে লইয়া মঠের ঠাকুর-ঘরে গেলেন। স্বামী সারদানন্দ দলের অগ্রণী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাদাম কাল্‌ভে, ফরাসী মহিলাগণ এবং মঠের সাধু, ভক্ত ও দর্শকগণ। ঠাকুর-ঘরে কাল্‌ভে নতজানু হইলেন, তখন সেই গাম্ভীর্য তিরোহিত। তখন তিনি হাসময়ী আনন্দোৎফুল্লা। তিনি স্বামী সারদানন্দকে বলিলেন, "স্বামিজী একটা বৈদিক প্রার্থনা করিতেন। উহার অর্থ—হে দেব! অন্ধকার হইতে আমাদিগকে আলোকে লইয়া যাও। ইত্যাদি। আপনি যদি তাহা জানেন তবে সেইটি অনুগ্রহপূর্বক এখানে আবৃত্তি করুন। সেইটি শুন্‌তে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে।" কাল্‌ভের অনুরোধে স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সুমধুর সুগভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—'অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।' সকলে বৈদিক প্রার্থনা শ্রবণে ধ্যানপ্রবণ হইলেন। পরে

স্বামী সারদানন্দ কাল্‌ভেকে অনুরোধ করিলেন, "মাদাম, আপনি ঠাকুরকে এখানে গান শুনাবেন না?" মাদাম সানন্দে হাস্যমুখে স্বামী সারদানন্দের অনুরোধে সম্মত হইলেন। তিনি তাঁহার কিন্নরকণ্ঠে ফরাসী সংগীত গাহিলেন। যদিও সেই সংগীতের অর্থ সকলের অবোধ্য ছিল তথাপি উহার গম্ভীর ভাব ও মধুর স্বর সকলের হৃদয়ে আনন্দের ঝঙ্কার তুলিল, হাজার বুলবুলের মিলিত কলনাদ কাল্‌ভের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। মধুর স্বরলহরী ও ভাবতরঙ্গ মঠের শান্ত স্নিগ্ধ বায়ুতরঙ্গকে কম্পিত আন্দোলিত করিয়া মহানন্দের হিল্লোল তুলিল। ভাবপূর্ণ ভাষাহীন বিহগকাকলী যেন প্রকৃতির অন্তর্বীণায় বাজিয়া উঠিল। ঠাকুর-ঘর যেন নিকুঞ্জের পক্ষীকূজনে মুখরিত হইল। মাদাম পরপর দুইটি গান গাহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সকলে ঠাকুর-ঘর হইতে নামিলেন। কাল্‌ভের অভ্যর্থনার জন্য মঠ-প্রাঙ্গণে চেয়ার ও টেবিলাদি সাজান হইয়াছিল। ফরাসে হাবু দত্ত মহাশয় স্বীয় দলবল সহ উপবিষ্ট। কাল্‌ভেকে স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রিসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মাদাম সহাস্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের করমর্দন করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে মাদাম কাল্‌ভে চেয়ারে বসিয়া পাত্রে রক্ষিত ফলমিষ্টি আহার করিতে লাগিলেন। তখন হাবু দত্ত কনসার্টের সঙ্গে বংশী বাজাইলেন। বংশীবাদন শুনিয়া কাল্‌ভে অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। তিনি দেশী গান ও সুর শুনিতে চাহিলেন। হাবুবাবু তাহাই বাজাইলেন। পুনরায় কাল্‌ভে দেশী গান ইংরাজি নোটেশনে আনিয়া বাজাইবার জন্য হাবুবাবুকে অনুরোধ জানাইলেন। হাবুবাবু তাহাই করিলেন। পরে কাল্‌ভে ধীরে ধীরে মঠের সন্ন্যাসিগণের নিকট বিনীতভাবে বিদায় লইলেন। মোটর গাড়ীতে উঠিবার পূর্বে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্বামী সারদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি কে? ইনি অনেকটা স্বামিজীর মত দেখতে।' স্বামী সারদানন্দ মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া কাল্‌ভের সহিত আলাপ করিতে বলিলেন। মাদাম মহেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যখন স্বামিজীর সঙ্গে আমি কনস্টাণ্টিনোপলে যাই তখন আপনি সেখানে ছিলেন কি?" মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'না। আপনাদের যাবার কিছু পূর্বেই আমি সে স্থান ত্যাগ করেছিলাম।' পরদিবস বৈকালে মহেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য কাল্‌ভে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা যখন বেলুড় মঠ ছাড়িলেন তখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের স্বর্ণাভ

রশ্মিজালে পশ্চিমাকাশ সুরঞ্জিত। একটু পরেই আনন্দোৎসবের অবসানে বিষণ্ণা ধরণী অন্ধকারে ম্লান মুখ ঢাকিলেন।

মহেন্দ্রবাবু পরদিন বৈকালে তিনটা হইতে চারটার মধ্যে কাল্‌ভের সহিত দেখা করিবার জন্য গ্র্যান্ড হোটেলে উপস্থিত হইলেন। দোভাষী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসাইলেন এবং দুঃখের সহিত জানাইলেন, 'মাদামের শরীর অসুস্থ। কাল বেলুড় মঠ থেকে ফিরবার সময় তাঁর ঠান্ডা লেগেছিল। তাই তাঁর সর্দি হয়েছে, বড় কষ্ট পাচ্ছেন। সেজন্য আজ কনসার্ট বন্ধ করা হয়েছে।' মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'মাদাম অসুস্থ শুনে আমরা বড়ই দুঃখিত। আমরা তবে এখন বিদায় নিচ্ছি।' দোভাষী তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের আসার সংবাদ মাদামকে পাঠান হয়েছে। তাঁর কথা শুনে বিদায় নেবেন।' এমন সময় এক ফরাসী মহিলা আসিয়া আস্তে আস্তে ফরাসীতে দোভাষীকে কিছু বলিলেন। দোভাষী তখন মহেন্দ্রবাবুকে জানাইলেন, 'মাদাম শয্যায় শায়িতা। তিনি পীড়িতা বলে এখানে এসে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারছেন না। তাই তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি তাঁর শয়ন-কক্ষে আপনাদের ডাকছেন।'

মহেন্দ্রবাবু সংকোচে ও সন্তর্পণে মাদামের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় কাল্‌ভে গন্ধর্ব বা অপ্সরার ন্যায় শায়িতা। মহেন্দ্রবাবু তাঁহাকে অবনত মস্তকে অভিবাদনপূর্বক দাঁড়াইলেন। মহেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে কাল্‌ভে বলিলেন, 'আপনি এসেছেন, বড় সুখী হলাম। কাল সন্ধ্যায় বেলুড় মঠ থেকে ফিরবার সময় ঠান্ডা হাওয়া লেগে সর্দি হয়েছে।' ইহা বলিয়া মাদাম অর্ধশায়িত অবস্থায় বালিশে হেলান দিতে উঠিলেন। সেই সময় দেখা গেল, বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক উপহৃত স্বামিজীর ফটোগুলি তাঁহার বুক হইতে বিছানায় ছড়াইয়া পড়িল। এই পীড়িত অবস্থায় তাঁর নির্জন শয়নকক্ষে স্বামিজীর ছবিগুলি বুকের উপর রাখিয়া তিনি শুইয়া ছিলেন। ইহা দেখিয়া মহেন্দ্রবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি এই ফরাসিনী গায়িকার, এই বিদেশিনী সাধিকার কি প্রাণভরা প্রীতি! কি গভীর ভক্তি! কাল্‌ভে সেই ছবিগুলি একে একে দেখিয়া আবার বুকের উপর রাখিলেন। পরে মহেন্দ্রবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'বেলুড় মঠে কাল কি আনন্দে সময় কাটালাম? এ আমার জীবনের একটী স্মরণীয় দিন, কখনো তা ভুলতে পারবো না।'

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'মাদাম! যদি কাল একটু আগে আসতেন তবে বোধ হয় এই অসুখ হোত না।' মাদাম বল্লেন, 'এই সর্দির জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। কাল বেলুড় মঠে যেন একটী সুরলোকের সংগীতের মত, একটী কবিতার কাব্যালোকের মত কেটেছে। স্বামিজীর সমাধিস্থান দর্শন করে অসীম আনন্দ পেয়েছি। কি পবিত্র শান্তিময় স্থান!' ইহা বলিয়া মাদাম একটী বন্ধ খাম বালিশের নীচে হইতে তুলিয়া মহেন্দ্রবাবুকে দিয়া বলিলেন, 'বেলুড় মঠে এটী দেবেন সাধুদের সেবার জন্য।' মহেন্দ্রবাবু বিদায় লইতে চাহিলেন। তখন কাল্‌ভে ধীরে ধীরে ভক্তিভরে বলিলেন, 'আমি বড় আনন্দিত হ'লাম। স্বামিজীর কথা আর কি বলবো? তাঁর ধ্যানে, তাঁর বাণীতে মানুষ নূতন জীবন গড়ে তুলতে পারে। জগতের পতিত দুর্বল ব্যথিতদের জন্য তাঁর কি অগাধ প্রেম ছিল! কি অকৃত্রিম সহানুভূতি! বর্তমান কালে খ্রীষ্টের মত তিনি মানবজাতির পরিত্রাতা, নব যুগের প্রবর্তক!'

বেলুড় মঠ পরিদর্শনের কথা কাল্‌ভে তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন।— "স্বামিজী যে মঠে শেষ জীবন যাপন করেন তাহা দেখার ইচ্ছা হয় আমার ভারত ভ্রমণ কালে। বেলুড় মঠে স্বামিজীর মার্বেল-নির্মিত সুন্দর সমাধি-স্থানটী দেখিলাম। তাঁর এক আমেরিকান্ শিষ্যা শ্রীমতী লেগেটের ব্যয়ে এই মন্দির নির্মিত। ইহাতে স্বামিজীর কোন নাম লেখা ছিল না। এই অনুল্লেখের কারণ তাঁহার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বিস্মিত নয়নে আমার দিকে চাহিলেন। তখন তিনি এমন অপার্থিব ভাবভংগী দেখাইলেন যাহা আমার মানস পটে এখনো মুদ্রিত আছে।......স্বামিজীর গুরুভ্রাতাগণ আমাদিগকে সহজ আন্তরিক আতিথেয়তার সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। মঠ-প্রাংগণের শীতল ছায়ায় মাঠের উপর টেবিল রাখিয়া আমাদিগকে ফলমিষ্টি খাইতে দিলেন। পার্শ্বে বিপুলস্রোতা গংগা প্রবাহিতা। সংগীতজ্ঞগণ বীণাদি বাদ্যযন্ত্র বাজাইলেন। সেই যন্ত্র-সংগীত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিল। মঠে সেই বৈকালটী নীরব ধ্যানময় প্রশান্তিতে কাটিল। এই ভদ্র দার্শনিকগণের নিকট আমার যে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল আমার স্মৃতিতে সেগুলি সদা সমুজ্জ্বল থাকিবে। এই সব পবিত্রাত্মা, শান্তস্বভাব, বিদেশীয়গণকে অন্য জগতের লোক বলিয়া মনে হইল। তাঁহারা যেন অধিকতর সমুন্নত জ্ঞানময় লোকে বাস করেন।"

প্রায় বিশ হইতে ষাট বৎসর পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর দীর্ঘ ছিল কাল্‌ভের গায়িকা-জীবন। প্রাতরুত্থান, প্রাতর্ভ্রমণ, আহার-সংযম, উন্মুক্ত বাতায়নের পার্শ্বে শয়নাদিতে

নিত্য অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া তিনি এত দীর্ঘজীবী, স্বাস্থ্যবতী ও পরমা সুন্দরী ছিলেন। একটানা চারি ঘণ্টা নৃত্যবাদ্যগীতাদি করিয়াও তিনি ক্লান্ত হইতেন না। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রোড়ে বসিয়াও তিনি সংযমকে জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে প্রাণায়ামসংযুক্ত প্রার্থনা শিক্ষা দেন। তাহা নিয়মিত অভ্যাস করিয়া তিনি ধর্মজীবনেও সমুন্নত হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে প্রাণায়ামমূলক প্রার্থনা শিক্ষা দেন। তিনি বলিতেন, দেবশক্তি বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। নিয়মিতভাবে গভীর নিশ্বাস গ্রহণের দ্বারা সেই শক্তি দেহমনে সঞ্চারিত হয়। ইহার ফলে দীর্ঘ জীবন, অসীম শক্তি ও চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়।"

গায়িকা ও নর্তকীর জীবন যাপন করিলেও কাল্ভে ধর্মপ্রাণা সাধিকা ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিতেন, 'সংগীত সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প। যারা সংগীতের মর্ম বোঝে ইহা তাদের নিকট উৎকৃষ্ট উপাসনা।' কাল্ভে সংগীত সাধনার দ্বারা ধর্ম সাধনায় উপনীত হন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীর একস্থানে লিখিয়াছেন।—"আমি বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাবলী পড়িতাম। কিন্তু ধর্মদর্শনাদি যে সকল বিষয়ের সহিত আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কিত সেই বিষয়সমূহ পড়িবার ও জানিবার আমার আগ্রহ সর্বাপেক্ষা অধিক। অতি শৈশব হইতেই ধর্মভাব আমার জীবনে প্রবল ছিল। আমার কর্মজীবন স্বামী বিবেকানন্দ নামক এমন এক মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিল যাঁহার সুশিক্ষা, সৎচরিত্র আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। গভীর আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসের বলেই আমার কঠোর কর্মময় জীবনে সাহস ও শক্তি পাইয়াছি এবং পরম শান্তি ও অভয় লাভ করিয়াছি।"

অষ্টম মণি

যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যাগণের মধ্যে যোগীন্দ্রমোহিনী অন্যতমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগীন মা নামে পরিচিতা। খড়দহের বিখ্যাত ধনাঢ্য জমিদার অম্বিকাচরণ বিশ্বাস তাঁহার পতি ছিলেন। বিশ্বাসবংশ দানশীলতা ও ধর্মপ্রাণতার জন্য বাংলায় সুখ্যাত ছিল। বিশ্বাসগণ শাক্ত ছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ স্বনামধন্য প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস সুপ্রসিদ্ধ 'প্রাণতোষিণী তন্ত্র' সংকলন করেন। তাঁহারা একটী রত্নবেদী নির্মাণ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। উক্ত বেদীর নিম্নে একলক্ষ শালগ্রাম শিলা প্রোথিত থাকে। তন্মধ্যে আশি হাজার শিলা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু, দৈব দুর্বিপাকে উক্ত শুভ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই। বৈষ্ণবাচার্য নিত্যানন্দ প্রভুর লীলাস্থলরূপে খড়দহ তীর্থক্ষেত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ খড়দহের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ দর্শনে যাইতেন।

১৮৫১ খৃীঃ ১৬ই জানুয়ারী কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে যোগীন্দ্রমোহিনী জন্মগ্রহণ করেন। বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং গোলাপ মা প্রভৃতি রামকৃষ্ণ শিষ্যগণ তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁহার পিতা প্রসন্নকুমার মিত্র ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসক এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। প্রসন্নকুমারের গৃহপার্শ্বে স্বীয় উদ্যান ও শিবমন্দির ছিল। যোগীন্দ্র-মোহিনী তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভের দ্বিতীয়া কন্যা। ছয় সাত বৎসর বয়সে যোগীন্দ্রমোহিনী খড়দহ বিশ্বাসবংশের এক প্রিয়দর্শন পোষ্যপুত্র অম্বিকাচরণের সহিত পরিণীতা হন। অম্বিকাচরণ যৌবনে মদবেশ্যাসক্ত হইয়া সর্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী হন। যোগীন মার একটি পুত্র ছয় মাস বয়সে মারা যায়। একটি মাত্র কন্যা লইয়া তিনি পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কন্যাটির ডাক নাম গনু। যোগীন্দ্রমোহিনী গৃহে ও পল্লীতে গনুর মা নামে কথিতা। গনু বিবাহিতা এবং কয়েকটি সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। পিত্রালয়ে আশ্রয় লইবার সময় যোগীন মার পিতা স্বর্গগত এবং মাতামাত্র জীবিতা।

এখন যোগীন্দ্রমোহিনী যৌবনে প্রবিষ্টা। তাঁহার স্বামীকুল উৎসন্ন। তিনি সমগ্র জীবন কি ভাবে কাটাইবেন? মনে দুশ্চিন্তার ঝড় উঠিল। জীবনের পথ কোনটি? তাঁহার মাতামহী শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে কালী-মন্দিরে এক পরমহংস আছেন শুনিয়া মাতামহী তথায় যান। তিনি পরমহংসকে চিনিতেন না। সাদাসিদে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, ইনিই পরমহংস। বৃদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কোন পরমহংস থাকেন কি? ঠাকুর তখন ভাবাবিষ্ট ছিলেন। তিনি স্বীয় পরিচয় না দিয়া বলিলেন, 'খুঁজে দেখ।' বলরাম বসু যোগীন্দ্রমোহিনীর শ্বশুর-বাড়ীর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম বাবুর বাড়ীতে আসিলে যোগীন্দ্রমোহিনী তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইলেন। তখন ঠাকুর দিব্য ভাবের আবেশে মাতালের মত টলটল করিতেছিলেন। গনুর মার তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল মাতাল সম্বন্ধে। তিনি প্রথম দর্শনে ঠাকুরকে মাতাল কালীসাধক মনে করিলেন। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীভক্তের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কয়েকবার গমনের পরেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব বুঝিলেন ও তাঁহার কৃপা পাইলেন। যোগীন্দ্রমোহিনীর শোক দূর হইল, অশান্তি কমিল। তাঁহার হৃদয় শান্তিবারি সিঞ্চনে শীতল হইল। তিনি জীবনের পথ পাইলেন। শ্বশুরবাড়ীর কুলগুরুর নিকট তিনি যে দেবীমন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন তাহাই ঠাকুর জপ করিতে বলিলেন। অচিরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যার পদে আরূঢ়া হইলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র তৃতীয় খণ্ডে (১৯।২।২৩৬) আছে—তিনি ঠাকুরকে বলিতেছেন, 'আমার ঘরটায় একবার পায়ের ধুলো দিন। ঘর কাশী হয়ে থাকবে।' ঠাকুর এই শিষ্যাটির গৃহে পদার্পণপূর্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করেছিলেন। কয়েকবার ঠাকুরের আগমনে শিষ্যার পিত্রালয় সত্যই তীর্থে পরিণত হয়েছিল। যোগীন্দ্রমোহিনীর কন্যা গনুও শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী অম্বিকাচরণের সে সৌভাগ্য হইল না। অম্বিকাচরণ কুকুর-দংশনে ও তজ্জনিত জ্বরে শ্বশুরালয়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।*

দক্ষিণেশ্বরে দুই চারিবার গমনের পর যোগীন মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী সারদা দেবীর সহিত পরিচিতা হন। উভয়েই প্রায় সমবয়সী ছিলেন। এইজন্য প্রথম

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৪২ জুন ও জুলাই সংখ্যাদ্বয়ে স্বামী নির্লেপানন্দের প্রবন্ধ দেখুন।

পরিচয়ে উভয়ের মধ্যে খুব ভাব ও পরস্পর টান হয়। সারদা দেবীর সম্বন্ধে যোগীন মা বলিতেন, "আমি যখনই যেতুম আমাকে মা নিজের সব কথা বলতেন ও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতেন। আমি মায়ের চুল বেঁধে দিতুম। আমার হাতের চুলবাঁধা মা এমনি ভালবাসতেন যে, তিন চারিদিন পরেও নাইবার সময় মাথার চুল খুলতেন না। বলতেন, 'ও যোগীনের বাঁধা চুল। সে আবার আসলে সেই দিন খুলব।' আমি সাত-আটদিন পর পর যেতুম। দক্ষিণেশ্বরে কখনো কখনো রাত্রে থাকতুম নহবতে। আমি আলাদা শুতে চাইতুম। মা কোন মতেই ছাড়তেন না, কাছে টেনে নিয়ে শুতেন। সেই প্রথম দর্শনের কিছুকাল পরে মা যখন দেশে রওনা হলেন যতদূর নৌকা দেখা গেল দাঁড়িয়ে রইলুম। নৌকা অদৃশ্য হ'তে নহবতে এসে খুব কাঁদতে লাগলুম। ঠাকুর পঞ্চবটীর দিক থেকে আসতে তা দেখতে পেয়ে ঘরে গিয়ে আমাকে ডাকালেন। বললেন, 'ও চলে যেতে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে।' এইসব বলে আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ঠাকুর তাঁর তান্ত্রিক সাধনার সব ঘটনা বলতে লাগলেন। এক দেড় বছর পরে মা যখন দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন ঠাকুর মাকে বলেছিলেন, 'সেই যে ডাগর ডাগর চোখ মেয়েটি আসে সে তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি যাবার দিন নহবতে বসে খুব কাঁদছিল।' মা বললেন, 'হাঁ। তার নাম যোগেন।'

যোগীন মা গুরু-কৃপায় আধ্যাত্মিক জীবনে দ্রুতবেগে উন্নত হইতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সংস্পর্শে তিনি ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া সাধন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের আর কি বাকী গো? (নিজের শরীর দেখাইয়া) তোমরা একে দেখলে, খাওয়ালে ও সেবা করলে।' যোগীন মা বিবাহের পূর্বে এক গুরুমার নিকট সামান্য লেখাপড়া ও অংক শিখেছিলেন। এখন শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসাহে ধর্মগ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। অধ্যবসায়গুণে তিনি ভাগবতাদি পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে পুস্তকাবলী আয়ত্ত করিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ্ন ছিল যে, এই সকল গ্রন্থের, বিশেষতঃ চৈতন্যচরিতামৃতের, অনেক স্থল তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। তিনি পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহ যথাযথভাবে বিবৃত করিতে পারিতেন। ভগিনী নিবেদিতা যখন হিন্দুধর্মের উপাখ্যান সম্বন্ধে তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তখন যোগীন মার গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পুরাণ-জ্ঞান তাঁহার বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় নিবেদিতা যোগীন মার নিকট স্বীয় ঋণ স্বীকার

করিয়াছেন। বহু বৎসর ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সৌভাগ্য হওয়ায় তিনি ঠাকুরের জীবনের অনেক ঘটনা জানিতেন। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গে' যোগীন মার অনেক কথা উদ্ধৃত আছে।

শ্বশুরালয় হইতে যোগীন মা যে স্ত্রীধন পেয়েছিলেন তাহাতেই তাঁহার বৈধব্য-জীবনের ব্যয় সংকুলান হয়। মাঝে মাঝে তিনি তীর্থবাস করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অসুখের সময় তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার অব্যবহিত পরেই সারদা দেবী বৃন্দাবনে যান। যোগীন মা বলিতেন, "মার সঙ্গে আমার দেখা হতেই 'ও যোগীন গো' বলে মা আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বিহ্বল হয়ে কাঁদতে থাকেন। বৃন্দাবনে আমরা দুজনেই ঠাকুরের অভাবে খুব কান্নাকাটি করতাম। একদিন ঠাকুর দেখা দিয়ে বল্লেন, 'হ্যাঁগা, তোমরা এত কাঁদছ কেন? এই ত আমি রয়েছি, গেছি কোথায়? এই এ ঘর, আর ও ঘর!' বৃন্দাবনে যোগীন মা ভগবৎধ্যানে এত তন্ময় হইতেন যে, একবার লালাবাবুর ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যার পরে ধ্যান করিতে করিতে গভীর সমাধি লাভ করেন। তিনি নিশ্চল দেহে গভীর সমাধিতে নিমগ্না এবং বাহ্য-জ্ঞানশূন্যা! রাত্রির ভোগারতি শেষ হইলে মন্দিরের বহির্দ্বার বন্ধ করিবার সময় আসিল। কিন্তু তিনি উঠিতেছেন না। মন্দিরের সেবায়েতগণ তাঁহাকে ডাকিলেন, 'ও মায়ি উঠ, ও মায়ি উঠ।' কিন্তু সমাধিমগ্না সাধিকার কর্ণে এই ডাক প্রবেশ করিল না। এদিকে এত রাত্রিতে তিনি বাসায় ফিরিতেছেন না দেখিয়া সারদা দেবী স্বীয় সন্ন্যাসীসেবক স্বামী যোগানন্দকে যোগীন মার খোঁজে পাঠাইলেন। আলো হাতে লইয়া যোগানন্দ স্বামী অন্ধকার পথ অতিক্রম করিয়া পূর্বোক্ত মন্দিরে গেলেন। এই মন্দিরে আসিয়া যোগীন মা প্রায়ই জপধ্যান করিতেন। সুতরাং যোগানন্দজী এখানেই প্রথমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পাইলেন। কিন্তু দেখিলেন, সেবায়েতগণ তাঁহার হুঁস আনিতে পারিতেছেন না। তিনি ঠাকুরের নাম সাধিকার কর্ণে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যোগীন মার বাহ্যজ্ঞান ফিরিল এবং তিনি বাসায় চলিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে ধ্যানমগ্নতার কথা উল্লেখ করিয়া যোগীন মা বলিতেন, 'তখন আমার মন এমন তন্ময় হয়েছিল যে, জগৎ আছে কি নাই এও যেন আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল।'*

কলিকাতায় পিত্রালয়েও যোগীন মার আর একবার সমাধি হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'যোগীন মা, তোমার দেহও সমাধিতে যাবে।

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩১ আষাঢ় সংখ্যায় স্বামী অরূপানন্দের প্রবন্ধ দেখুন।

একবারও যদি সমাধি হয় দেহত্যাগের সময় তার সেই স্মৃতি আবার আসে।' স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রসঙ্গে যোগীন মা একবার বলিয়াছিলেন, 'এক সময় আমার এমন এক অবস্থা হয়েছিল তখন যে দিকে চাই সর্বত্রই ইষ্টদর্শন হতো। তিন দিন এই অবস্থা ছিল।' তাঁহার দুটি বালগোপাল মূর্তি ছিল। পরম স্নেহে তাঁহাদের পূজা সেবা করিতেন, এবং ভাবাবস্থায় তাঁহাদের দিব্য দর্শন পাইতেন। বালগোপাল তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেন, মিষ্টান্ন খাইতে চাইতেন এবং তাঁহার সঙ্গে খেলা করিতেন। যোগীন মা এই প্রসঙ্গে বলিতেন, "একদিন পূজাকালে ধ্যান করতে করতে দেখি কি দুইটী অনুপম সুন্দর বালক হাসতে হাসতে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ে বলছে, 'আমরা কে চেন?' আমি বল্লুম, 'তোমাদের আবার চিনি না? এই তুমি বীর বলরাম, আর তুমি কৃষ্ণ।' ছোটটী (কৃষ্ণ) বল্লে, 'আমাদিগকে তোমার মনে থাকবে না। কেন না, এই ওদের জন্য.' এই বলে আমার নাতিদের দেখালে।" সত্যই যোগীন মার একমাত্র কন্যা গনুর মৃত্যুর পর নিরাশ্রয় দৌহিত্র তিনটীর উপর কিছুকালের জন্য তাঁহার মন পড়িয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা ক্রমশঃ শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল।

গৃহীর ন্যায় থাকিলেও যোগীন মা তন্ত্রমতে পূর্ণাভিষিক্ত (তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী) ছিলেন। পুরীধামে স্বামী সারদানন্দের নিকট বিরজা হোমান্তে তিনি বৈদিক সন্ন্যাসও গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তথায় তখন উপস্থিত ছিলেন। পূজাদির সময় তিনি গেরুয়া কাপড় পরিতেন, অন্য সময়ে নহে। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে সারদা দেবী যখন পঞ্চতপা করেন তখন যোগীন মাও তাঁহার সঙ্গে পঞ্চতপা করিয়াছিলেন। সারদা দেবী বলিতেন, 'যোগীন খুব তপস্বিনী, এখনও কত ব্রত উপবাস করে।' বৈধী পূজার্চনা বিষয়ে যোগীন মার যেরূপ জ্ঞান ও নিষ্ঠা ছিল, সেরূপ খুব কম সাধিকারই দেখা যায়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা তান্ত্রিকপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট তিনি দেবীপূজা যথাবিধি শিক্ষা করেন। তাঁহার পিত্রালয়ে প্রত্যেক বৎসর মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রীপূজা হইত। তখন সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ তাঁহার বাড়ীতে যাইতেন। সকল দেবতার প্রতি যোগীন মার সমান ভক্তি ছিল। তিনি শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি সকল দেবতাকে পূজা ও অর্চনা করিতেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। একদিকে তাঁহার যেমন পূজা, পাঠ, ব্রত, উপবাস, সদাচার ও সাধুসেবা

এবং সর্বোপরি রাগানুগা ভক্তি ছিল অন্য দিকে ছিল তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও তত্ত্বজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিয়াছিলেন, 'মেয়ের মধ্যে যোগীন জ্ঞানী।'

বৃদ্ধ বয়সেও যোগীন মার জপধ্যানে পূর্ববৎ অনুরাগ ছিল। যথাসময়ে নিত্য যতক্ষণ জপধ্যান করিতেন কর্মকোলাহলের মধ্যেও তাহার একটুকুও ব্যতিক্রম হইত না। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের পর ঘাটে বসিয়া প্রায় দুই আড়াই ঘণ্টা তন্ময় হইয়া জপধ্যান করিতেন। দুরন্ত শীত বা বর্ষায় তাহা একদিনও বন্ধ যাইত না। সাধু-ব্রহ্মচারিগণ আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেন, লোকের ত একদিন বাদ যায় বা আলস্য হয়; কিন্তু এঁর সেটি নাই। জপধ্যানের সময় তাঁহার এত গভীর তন্ময়তা আসিত যে, অনেক সময় তাঁহার চোখের ভিতর মাছি ঢুকিয়া খুঁটিত, তাহা তিনি আদৌ টের পাইতেন না। ধ্যানের সময় তাঁহার চক্ষুদ্বয় ঈষৎ উন্মুক্ত থাকিত। সারদা দেবী স্ত্রীভক্তদের বলিতেন, 'গোলাপ, যোগীন এরা কত ধ্যান জপ তপস্যা করেছে, সে সব আলোচনা করা ভাল, এতে কল্যাণ হবে।' অন্তিম অসুখের সময় যখন উঠিয়া বসিবার শক্তি ছিল না তখনও যোগীন মাকে ধরিয়া বসাইয়া দিতে হইত নিয়মিত জপধ্যান এবং শাস্ত্রপাঠ শ্রবণের জন্য। ধ্যান পূজাদিতে এত নিষ্ঠা সত্ত্বেও সাংসারিক কাজকর্মে কখনও তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না। নিত্য স্নানাহ্নিক অবসানে উদ্বোধন মঠে যাইয়া ঠাকুর-ভোগের জন্য দুই বেলা তরকারী কাটিতেন এবং মঠের আবশ্যক কাজকর্ম সারিয়া দ্বিপ্রহরে পিত্রালয়ে ফিরিয়া নিজের ও বৃদ্ধা জননীর জন্য রন্ধনাদি করিতেন। আবার বৈকালে উদ্বোধন মঠে যাইয়া রাত্রির ভোগ নিবেদন পর্যন্ত থাকিতেন। এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর তিনি সারদা দেবীর সঙ্গ ও সেবা করিতেন।

দেবস্থান বা তীর্থাদিতে যাইলে যোগীন মা দীন দুঃখীকে যথাসাধ্য দান করিতেন। প্রত্যেকেই দু'এক পয়সা পাইত, কেহ শুধু হাতে ফিরিত না। গোলাপ মা বলেন, 'যোগীন পয়সা দিয়ে এমন করেছে যে, এখন ভিখারী এলেই পয়সা চায় এবং বলে, 'মা আমরা এখানে একটী করে পয়সা পেয়ে থাকি।' তীর্থস্থানে গেলে যোগীন মা সঙ্গীদের সযত্নে খাওয়াইতেন। সারদা দেবীর সঙ্গে তিনি প্রায়ই জয়রাম-বাটী এবং কামারপুকুরে যাইয়া থাকিতেন। এই দুই পুণ্যস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর সম্পর্কিত লোকজনকে সাধ্যমত কিছু না কিছু দিতে ভুলিতেন না। একবার জয়রামবাটীতে সারদা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্বামী সারদানন্দ গমন করেন। যোগীন মা ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া উক্ত উৎসবে গিয়াছিলেন। তাঁহার বৈধব্যজীবনটি

তপস্যাময় ছিল। একবার তিনি ছয় মাস জলপান করেন নাই, জলের পরিবর্তে দুধ খাইতেন। প্রয়াগে একটি শীত ঋতু কল্পবাস করেন। উক্ত তপানুষ্ঠানকালে তিনি ত্রিবেণীতীরে বাস করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণ এবং ভক্তগণ যোগীন মাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। যোগীন মাও ব্রহ্মানন্দজীকে সযত্নে খাওয়াইতেন। উদ্বোধন মঠে যখন স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিমন্ত্রণ হইত, তখন যোগীন মা আনন্দে অধীর হইতেন। তাঁহার জন্য কত রকম রান্নার ব্যবস্থা করিতেন এবং নিজেও দুই একটী তরকারী প্রস্তুত করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দও যোগীন মাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন। হয়ত যোগীন মা গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতেছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ হইতে নৌকায় কলিকাতায় আসিতেছেন। তীরে নামিয়াই স্বামিজী বলিতেন, 'যোগীন মা, আজ তোমার ওখানে দুটি খাব গো, পুঁই শাক চচ্চড়ি করো।' একবার স্বামিজী যখন কাশীতে ছিলেন, তখন যোগীন মাও তথায় উপস্থিত। স্বামিজী যোগীন মাকে দেখিয়া বলিলেন, 'এই তোমার বিশ্বনাথ এলো গো!' স্বামিজী যোগীন মার রান্না খেতে এত ভালবাসিতেন যে, আবদার করিয়া তাঁহাকে বলিতেন, 'আজ আমার জন্মতিথি গো! আমাকে ভাল করে খাওয়াও, পায়েস কর।'

সারদা দেবীর জীবনের সহিত যোগীন মা এবং গোলাপ মার জীবন প্রীতি-সূত্রে গ্রথিত। সারদা দেবী বলিতেন, 'আমার জীবনে যা সব হয়েছে, এই গোলাপ, যোগীন, এরা সব জানে।' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শিষ্যা যোগীন মার সম্বন্ধে বলিতেন, 'ও কুঁড়ি ফুল নয় যে, একটুতেই ফুটে যাবে। ও যে সহস্রদল পদ্ম, ধীরে ধীরে ফুটবে।' সারদা দেবীর দেহত্যাগে যোগীন মার শরীর মন ভাঙ্গিয়া যায়। শেষ দুই বৎসর তিনি বহুমূত্র-রোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থ ও জীর্ণ দেহে তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরম বিকাশ হয়। 'হা গোপাল! হা গোপাল!' বলিয়া তিনি প্রায়ই ভাবসমাধিতে ডুবিতেন। শ্রীগুরুর উল্লিখিত উক্তি শিষ্যার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। জীবনের শেষ দুই তিন দিন তিনি আহার ও পানীয় গ্রহণ করেন নাই। স্বামী সারদানন্দ চিকিৎসককে অনুরোধ করিলেন, যোগীন মার বহুমূত্রজনিত সংজ্ঞাহীনতা হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, উক্ত রোগের কোন লক্ষণ রোগীর দেহে নাই। তখন স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, 'যোগীন মা সমাধিতে দেহরক্ষা করিবেন। ১৯২৪ খৃীঃ ৪ঠা জুন (১৩৩১

সাল, ২১শে জ্যৈষ্ঠ) বুধবার রাত্রি সাড়ে দশটার সময় যখন ঠাকুরের ভোগ নিবেদন এবং সাধুব্রহ্মচারিগণের আহারাদি সমাপ্ত হইয়াছে এবং উদ্বোধন মঠ নিস্তব্ধ তখন স্বামী সারদানন্দ যোগীন মার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতেছেন। সর্বশেষে তিনি নিম্নোক্ত বৈদিক শান্তিবচন উচ্চারণ করিলেন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
হরি ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শান্তিবচন উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগীন মার পূত প্রাণ পঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিল। যোগীন মা ৭৩ বৎসর বয়সে সমাধিযোগে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে মিলিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর সাধিকা যোগীন্দ্রমোহিনীর জীবন নিঃস্বার্থ সেবা ও সপ্রেম সাধনার নিরবচ্ছিন্ন স্রোতস্বরূপ ছিল। তাঁহার জীবন বাঙ্গালী বিধবাগণের আদর্শ ও অনুকরণীয়।

নবম মণি

অণ্ডাল

উত্তর ভারতে যেমন মীরাবাই দক্ষিণ ভারতে তেমন অণ্ডাল। অণ্ডাল গোদা দেবী নামেও পরিচিতা। 'অণ্ডাল' শব্দের অর্থ ত্রাণকারিণী বা মোক্ষদায়িনী। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যে দ্বাদশ জন সিদ্ধপুরুষ পূজিত হন অণ্ডাল তন্মধ্যে অন্যতম এবং একমাত্র সাধিকা, অন্য একাদশ জন সাধক। দ্রাবিড় দেশে এই মহাপুরুষগণকে আলবার বলা হয়। 'আলবার' শব্দের অর্থ ঈশ্বরপ্রেমিক, ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত। অণ্ডালের 'তিরুপ্পেবৈ' নামক পদ্যগ্রন্থ তামিল ভাষায় রচিত এবং তামিল নাডে প্রসিদ্ধ। 'তিরুপ্পেবৈ' গ্রন্থের উপর সংস্কৃত টীকা আছে।

দক্ষিণ ভারতে সাতুর রেলওয়ে ষ্টেশনের পঁচিশ মাইল পশ্চিমে তিনেভেলি জেলার অন্তর্গত শ্রীবিল্লিপুত্তুর গ্রাম অবস্থিত। উক্ত গ্রাম পূর্বে পাণ্ড্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বেদজ্ঞ ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের বাসভূমি ছিল। পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী ছিল মধুরপুরী এবং রাজা বল্লভদেব। হরিবংশে মধুরপুরীর উল্লেখ আছে। শ্রীবিল্লিপুত্তুরের সংস্কৃত নাম ধন্বীনব্যপুর। এই গ্রামে রাজা বল্লভদেবের গুরু পেরিয় আলবার বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বিষ্ণুচিত্তর বাস করিতেন। তাঁহার পিতা মুকুন্দ ও মাতা পদ্মা দেবী সদা ধর্মানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। পেরিয় আলবার ছিলেন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ মহাপুরুষের একজন। তিনি গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বটপত্রশায়ীর মালাকার ও উপাসক ছিলেন। তাঁহার একটী ক্ষুদ্র তুলসীকানন ছিল। নিত্য পূর্বাহ্ণে গোবিন্দচরণপ্রিয়া তুলসী চয়ন করিয়া অন্যান্য সুগন্ধি সুন্দর ফুলের সহিত ভক্তিভরে মালা গাঁথিয়া ব্রাহ্মণ বটপত্রশায়ী দেবতাকে পরাইতেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নিঃসন্তান ছিলেন এবং বটপত্রশায়ীদেবকে সন্তানজ্ঞানে সেবাপূজা করিতেন। প্রবাদমতে একান্ন বৎসর বয়সে একদিন তুলসী-কাননে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে মৃত্তিকাবৃত একটী শিশু তিনি পাইলেন। সম্ভবতঃ তুলসীকাননে গোদার জন্ম হয়। রাজা জনক এইরূপেই সীতাকে প্রাপ্ত হন। সাধক বিষ্ণুচিত্তর দেখিলেন, শিশুটী কন্যা। কন্যাটীর সুন্দর কেশদাম থাকায় তিনি কন্যাটীর নাম রাখিলেন গোদা। গোদার ছবি পাওয়া গিয়াছে।

'দিব্যসূরীচরিতম্' নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থমতে অণ্ডালের জন্ম পূর্বফাল্গুণী নক্ষত্রে, আদি মাসে, ৯৭ নল বৎসরে, কলিযুগে। শ্রীবৈষ্ণব দার্শনিক বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব দ্বাদশ শতাব্দীতে। ভক্তিধর্ম্মের সম্যক্ সমৃদ্ধি ইঁহার পরবর্তী কালে মধ্য যুগে হয়। সুতরাং অণ্ডালের জন্ম নিশ্চয়ই ঐ সময়ে। অণ্ডাল পৌরাণিক সাধিকা নহেন, ঐতিহাসিক তাপসী। বিষ্ণুচিত্তর দেখিলেন, গোদা অতি সুন্দরী, চার্বঙ্গী, সুমধ্যমা, সুকেশা, পদ্মলোচনা, এবং গৌরবর্ণা। অশেষ যত্নে, অসীম স্নেহে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যাটীকে লালনপালন করিলেন। গোদার শৈশব অতিক্রান্ত এবং যৌবন সমাগত হইল। তিনি মহানন্দে আহারবিহার, ভ্রমণক্রীড়াদি করিয়া বেড়াইতেন। পিতা একমাত্র কন্যার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি নিত্য যে মালা গাঁথিয়া মন্দিরে রাখিতেন বটশায়ী দেবতার জন্য, কন্যা পিতার অনুপস্থিতিতে স্বীয় মস্তকে তাহা পরিধানপূর্বক দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজেকে দেখিতেন এবং বলিতেন, 'ফুলের মালা, সোনার হার ও বলয় পরিলে আমাকে কেমন সুন্দর দেখায়? এইরূপে অলঙ্কৃত হইলে কি আমি প্রভুর পত্নী হইতে পারি না?' সেইজন্য গাত্রমার্জন, গাত্রলেপন, অঙ্গশোভনাদি কার্য্যে গোদা সদা ব্যস্ত থাকিতেন। পিতা পুষ্পোদ্যান হইতে যে সকল সুন্দর সুন্দর কুসুম চয়ন করিয়া পূজাদির জন্য রাখিয়া স্নানাদি কার্য্যে যাইতেন গোদা সেই ফুলের মধ্য হইতে সেরা ফুলগুলি বাছিয়া স্বীয় কেশদাম সাজাইতেন এবং মালাটী গলায় পরিতেন। আবার পিতার প্রত্যাগমনের পূর্বেই সব ফুল ও মালা যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। স্নেহময় পিতা কন্যার চপল কর্ম্মের কোন সন্ধান পাইতেন না। হঠাৎ একদিন তিনি দেখিলেন, একটী দীর্ঘ কেশ ফুলের মধ্যে বিজড়িত আছে। পিতা অনায়াসেই বুঝিলেন, ইহা কন্যার মস্তকের কেশ। তিনি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং কন্যাকে তিরস্কারপূর্বক এইরূপ করিতে নিষেধ করিয়া পুষ্পরাশি জলে ফেলিয়া দিলেন। অন্যের ব্যবহৃত পুষ্প দেবপূজার অযোগ্য। সেদিন বাগানে আর ফোটা ফুল ছিল না। সুতরাং সেদিন আর দেবতাকে পুষ্পার্ঘ্য বা পুষ্পমালা দেওয়া হইল না।*

---

* আলকণ্ডাভিল্লি গোবিন্দাচার্য প্রণীত The Holy Lives of the Azhavars or the Dravida Saints নামক পুস্তকে অণ্ডালের বিস্তৃত জীবনী দেখুন।

সাধু বিষ্ণুচিত্তর একটী বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখিলেন। বটশায়ী আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে আজ ফুলের মালা দাও নাই কেন?' ব্রাহ্মণ সভয়ে করযোড়ে উত্তর দিলেন, 'প্রভো! গোদার অনবধানতায় মালা অপবিত্র হয়েছিল। তাই আমি সেই মালা জলে ফেলে দিয়েছি। আমায় ক্ষমা করুন।' বটশায়ী ক্রোধভরে বলিলেন, 'অপবিত্র! অপবিত্র! বরং বল পবিত্র! তোমার সুন্দর সুগন্ধি মালা গোদার ব্যবহার দ্বারা আরও সুগন্ধ, সুবাসিত ও সুপবিত্র হয়। আমরা ঐ মালা ভালবাসি, অন্য মালা চাহি না।' ভয়চকিত অবস্থায় ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার অদ্ভুত কন্যার কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'গোদা কি স্বর্গের কোন দেবী ছদ্মবেশে ধরাধামে বিচরণ করিতেছে?' সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেবপত্নী-রূপে গণ্য ও পূজ্য মনে করিতেন। তিনি নিত্য যে পুষ্পমাল্য তৈয়ার করিতেন তাহা গোদা কর্তৃক স্বকেশে পরিহিত হইবার পর দেবতাকে অর্পিত হইত। কিন্তু, ব্রাহ্মণ নিত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লক্ষ্য করিতেন, গোদার ব্যবহারে মালা সৌন্দর্য্যে ও সুগন্ধে আরও সমৃদ্ধ হইত। দেববাক্যের সত্যতা প্রমাণিত। তখন হইতে লোকে অণ্ডালের নাম রাখিল 'সুদিককোদত্ত-নাচ্চিয়ার' অর্থাৎ যে রাণী (মালা) পরিতেন ও (দেবতাকে) দিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডালের হৃদয়-লতায় প্রেমপুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। যৌবন-যমুনার প্রেমতরঙ্গে তিনি হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। মীরাবাইয়ের ন্যায় তিনি দেবপতির দর্শনলাভের জন্য আহার নিদ্রা ভুলিলেন। পতির বিরহে তিনি উন্মাদিনী হইলেন। ব্রজগোপীগণ যমুনা-পুলিনে রাসমণ্ডলে কৃষ্ণবিরহে যেমন কৃষ্ণলীলা স্মরণ, অনুষ্ঠান ও অনুকরণ করিয়াছিলেন অণ্ডাল তদ্রূপ অলৌকিক আচরণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপুরাণে (৫-১৩-২৭) আছে, গোপিকাগণ কৃষ্ণভাবে আবিষ্টা হইয়া বলিতেছেন—'দুষ্ট কালিয় তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।' ব্রজসুন্দরী-গণের ন্যায় তিনি কৃষ্ণাত্মিকা হইলেন। কৃষ্ণচিন্তায় কৃষ্ণধ্যানে তিনি কৃষ্ণময় হইলেন। জীবননদীতে প্রেমের জোয়ার আসিলে মানবত্ব, ক্ষুদ্রত্ব মুছিয়া যায়, দেবত্ব বৃহত্ব ফুটিয়া উঠে। বিরহাগ্নিতে গোদা দগ্ধ এবং মৃতপ্রায় হইলেন। কামদেবের স্তব ও ব্রতোপবাসাদিতে তাঁহার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইত। 'তিরুপ্পেবৈ' নামক গ্রন্থের ত্রিশটি কবিতায় তাঁহার পবিত্র ব্রতের কথা বিবৃত। 'তিরুপ্পেবৈ' শব্দের অর্থ

'পবিত্র ব্রত'। এই তামিল কবিতা দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। কবিতাটি গভীর প্রেমমূলক ও মধুর ভাবোদ্দীপক। অণ্ডালের কামদেবস্তুতি ১৪৩ তামিল শব্দে রচিত। কবিতাটির নাম 'নাচ্চিয়ার তিরুমোলি।' 'নাচ্চিয়ার তিরুমোলি' শব্দের অর্থ রাণীর শ্রেষ্ঠ ভাষণ। বিষ্ণুচিত্তর অণ্ডালের জন্য চিন্তান্বিত হইলেন। অণ্ডাল বিবাহযোগ্যা হইয়াছেন। কন্যার পরিণয়কাল সমুপস্থিত। কাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন? পিতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা কোন্ মানব তোমার পতি হইবার যোগ্য?' মানব শব্দের উল্লেখে অণ্ডাল সংক্ষুব্ধা হইয়া দুঃখে ক্রোধে পিতাকে বলিলেন, 'যদি কোন মানবের সহিত আমার বিবাহ দেন, আমার প্রাণবিয়োগ হইবে।' পিতা কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'তোমার নিশ্চয়ই দেবপতি লাভ হইবে মা। এক শত আট দেবতার মধ্যে কাহাকে তুমি পতিরূপে পাইতে চাও?' অণ্ডাল পিতাকে একশত আট দেবতার নাম করিতে বলিলেন। এই দেবতাগণের নামে একশত আটটী তীর্থস্থান আছে। 'দিব্যসূরীচরিতম্' নামক সংস্কৃত কাব্যে এই সকল প্রসিদ্ধ তীর্থের নাম উল্লিখিত। বিষ্ণুচিত্তর পাণ্ড্যরাজ্যের শ্রীবিল্লিপুত্তুর গ্রামের বটশায়ীপ্রমুখ দেবতাগণের নাম প্রথমে করিলেন। পরে অন্যান্য দেবতার নাম ও সর্বশেষে শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথের নাম করিলেন।

শ্রীরঙ্গনাথের নাম শ্রবণমাত্রেই অণ্ডালের চক্ষু সজল, দেহলতা কম্পিত এবং হৃদয় প্রেমাপ্লুত হইল। তিনি শ্রীরঙ্গনাথের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর কেশদাম, কমল-তুল্য লোচন, আরক্ত ওষ্ঠাধর এবং সুনীল কপোলের বর্ণনায় প্রমত্ত হইলেন। পিতা বুঝিলেন, কন্যা শ্রীরঙ্গনাথের সহিত পরিণীতা হইতে ব্যাকুলা। শ্রীরঙ্গনাথ ব্যতীত অন্য কাহাকেও অণ্ডাল পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না। জাগ্রতে ও স্বপ্নে রঙ্গনাথের চিন্তায়, রঙ্গনাথের রূপগুণ বর্ণনায় তিনি অভিভূতা হইলেন। 'তিরুমোঝি' গ্রন্থে (৫-৫-৯) অণ্ডালের বিরহবেদনার আকূতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। অণ্ডাল ভাবিলেন, 'রঙ্গনাথ কি আসিবেন? তাঁহার বিরহে আমি প্রাণশূন্যা হয়েছি। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রভু কবে দর্শন দিবেন?' অণ্ডালের প্রেমোন্মাদ দেখিয়া বিষ্ণুচিত্তর চিন্তিত হইলেন। দেবতার সহিত মানবের পরিণয় কিরূপে সম্ভব? বিষণ্ণ চিত্তে ব্রাহ্মণ নিদ্রামগ্ন হইলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীরঙ্গনাথ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। দেবতা বলিলেন, তিনিই তাঁহার কন্যাকে

বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবেন। নিদ্রাভঙ্গে ব্রাহ্মণের দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইল, হৃদয় হইতে দুর্ভাবনার ভার নামিয়া গেল। দৈব ঘটনার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

এদিকে শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরে পুরোহিতাদির প্রতি দেবাদেশ হইল, 'ছত্র, চৌরী, পাংখা, গদা প্রভৃতি লইয়া তোমরা শ্রীবিল্লিপুত্তুর গ্রামে যাও এবং অণ্ডালকে মহাসমারোহে আমার মন্দিরে আন।' শ্রীরঙ্গনাথের পুরোহিতগণ শ্রীবিল্লি-পুত্তুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুচিত্তরের নিকট দেবাদেশ ব্যক্ত করিলেন। বিষ্ণুচিত্তরের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি ইষ্ট দেবতা বটশায়ীর সম্মুখে প্রণত হইয়া সকল সংবাদ নিবেদনপূর্বক তাঁহার আশীর্বাদ ও অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। বটশায়ী তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ শিরোধার্য করিতে উৎসাহ দিলেন। পরমানন্দে ব্রাহ্মণ স্বগৃহে যাইয়া স্বকন্যা অণ্ডালকে বলিলেন, 'মা, তোমার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। তোমার দেবপতির পুরোহিতগণ তোমাকে লইতে আসিয়াছেন। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।' ইহা বলিয়া ভয়মিশ্রিত আনন্দে তিনি একটি পাল্‌কী প্রস্তুত করিলেন এবং কন্যাকে নূতন বস্ত্রে ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা করিয়া পাল্‌কীতে বসাইলেন। অণ্ডাল মহাসমারোহে শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীরঙ্গমে চলিলেন। বাদ্য-সংগীতনাদে কর্ণ বধির হইল। সকলে বলিতে লাগিল, রঙ্গনাথের রাণী বিবাহ করিতে যাইতেছেন। শ্রীরঙ্গম মন্দিরে উপস্থিত হইয়া অণ্ডাল মন্দিরে প্রবেশার্থ পাল্‌কী হইতে নামিলেন। মধুরের রাজা বল্লভদেব এবং বিষ্ণুচিত্তর তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও অন্যান্য সকলের ন্যায় ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক ও নিষ্পন্দ হইলেন। অণ্ডালের দেহে দিব্য জ্যোতির বিদ্যুৎ চমকিল। মন্দিরস্থ দেবমূর্তি প্রাণবান্ হইয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে অণ্ডাল দেবমূর্তির দিকে সহাস্যে, সপ্রেমে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দেহ সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃতা, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, কপালে চন্দনতিলক, মুখে হাসির জ্যোৎস্না, চক্ষে প্রেমাশ্রু। মানবী মূর্তি দেবমূর্তির সহিত চিরতরে মিলিতা হইলেন। পাঞ্চভৌতিক শরীর চিন্ময় দেহে পরিণত হইল। অণ্ডালের ভৌতিক দেহ আর দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎপরিহিত বস্ত্র ও মাল্যাদি মাত্র রঙ্গনাথের দেহে দেখা গেল। জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলেন। ভক্ত ভগবানের চিরসাযুজ্য লাভ করিলেন। আত্মিক মিলনই বিবাহের উদ্দেশ্য। প্রেমের চরম পরিণতিতে আত্মিক মিলন সম্ভব।

পরিণয়ান্তে দৈববাণী হইল, 'বিষ্ণুচিত্তরকে আমার সম্মুখে আন।' পুরোহিতগণ দেবাদেশ পালন করিলেন। পুনরায় বিষ্ণুচিত্তরের প্রতি দৈববাণী হইল—'তুমিও আমার শ্বশুরপদে উন্নীত হইলে। ক্ষীরার্ণব-নিকেতন নারায়ণ যেমন আমাকে শ্রীদান করেছিলেন তুমিও তদ্রূপ আমাকে তোমার কন্যা দান করিলে। তুমি ধন্য, তুমি ভাগ্যবান্।' তখন পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণকে সচন্দন পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। দেবাদেশে ব্রাহ্মণ শ্রীবিল্লিপুত্তুরে ফিরিয়া বটশায়ীর সেবায় কালযাপনপূর্বক স্বর্গগমনের অপেক্ষায় রহিলেন। অণ্ডালের মত কন্যারত্নলাভে কুল পবিত্র, জনকজননী কৃতার্থ এবং ধরণী পুণ্যবতী হয়।

দশম মণি

সেণ্ট টেরেসা

সেণ্ট টেরেসা পাশ্চাত্ত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠা সাধিকা। তিনি স্পেন দেশে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূতা হন। পঞ্চদশ শতকের শেষে স্পেনে গৌরবময় যুগ সমাগত হয়। তখন মুরগণ ও ইহুদীগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত, কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত এবং স্পেনীয় উপনিবেশ দেশান্তরে সংস্থাপিত। স্পেনের প্রভাব যখন সভ্য জগতে সুবিদিত তখন টেরেসার আবির্ভাব হয়।

১৫১৫ খৃীঃ ২৮শে মার্চ প্রাতে আভিলার দুর্গ-গৃহে টেরেসার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ডন আলোন্‌জো স্পেনের প্রাচীন রাজবংশীয় ছিলেন। অকালে প্রথমা পত্নী কালগ্রাসে পতিতা হইলে আলোন্‌জো ডোনা বিয়াট্রিজের পাণিগ্রহণ করেন। বিয়াট্রিজের গর্ভে, তাঁহার নয়টি পুত্র এবং তিনটি কন্যা হয়। কন্যাত্রয়ের মধ্যে টেরেসা একটি। আলোন্‌জো গর্বানুভব করিতেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ নির্দয় মুর-দিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করেন। তাঁহার প্রাসাদোপম গৃহে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। তিনি উক্ত গ্রন্থাগার হইতে দেশবিদেশের মহাপুরুষদের জীবনী পড়িতে ভালবাসিতেন। কিন্তু, তাঁহার পত্নী বিয়াট্রিজ রোমাঞ্চকর কাহিনী এবং শৌর্যবীর্যের বৃত্তান্ত পড়িতেন। আলোন্‌জোকে গৃহের স্ত্রীপুত্রকন্যাভৃত্যাদি সকলে ভয় করিত। গৃহস্বামী এত কর্তব্য-পরায়ণ ও নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন যে, পুত্রকন্যাভৃত্য-গণের কর্ম ও বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। তাঁহার আদেশ গৃহে রাজাজ্ঞা-তুল্য প্রতিপালিত হইত। পুত্রকন্যাগণ গম্ভীর ও কঠোর পিতাকে ভয় করিতেন। আলোন্‌জো দেবতুল্য প্রিয়দর্শন, সত্যনিষ্ঠ ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। তিনি পুত্র-কন্যাদের সহিত মিশিতেন না। তাহারা সত্যভঙ্গ বা কর্তব্যে অবহেলা করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। তিনি রুগ্ন, দরিদ্র ও দুর্গতদের প্রতি মুক্তহস্ত এবং ক্রীতদাসগণের প্রতি দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। তিনি পরনিন্দা, পরচর্চা ঘৃণা করিতেন।

ডোনা বিয়াট্রিজ পরমা সুন্দরী ও স্নেহপরায়ণা ছিলেন! টেরেসা তাঁহার ভগ্নীদিগকে স্বীয় জননী সম্বন্ধে বলিতেন, 'কোন গৃহের পুত্রকন্যাগণ আমাদের গর্ভধারিণীর মত এত ধীরা, এত স্নেহশীলা, এত দেবীতুল্যা, এত লালিত্যমণ্ডিতা

জননী পায় নাই। আমরা যেন তাঁহার গুণরাশির একাংশের অধিকারিণী হইতে পারি। আমি নিজেই তাঁহার মত সুশীলা, সুভদ্রা নারী হইতে চাই।' বারটি সন্তানের জননী হইয়া বিয়াট্রিজ তেত্রিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পতির নিকট এই একটিমাত্র বর প্রার্থনা করেন—'তুমি আমার সন্তানগণের প্রতি কোমল ও করুণ হইবে। তাহাদিগকে গৃহবন্ধ রাখিবে না এবং আমার অভাববোধ করিতে দিবে না।' মাতার মৃত্যুকালে টেরেসার বয়স মাত্র বার বৎসর ছিল। পত্নী-বিয়োগে আলোন্‌জোর কঠোর স্বভাব কোমল হইল। শোক, সন্তাপ ভুলিবার জন্য তিনি প্রিয়া কন্যা টেরেসার সাহচর্য চাহিতেন এবং টেরেসাকে কাছে বসাইয়া দেশ-বিদেশের সাধুমহাপুরুষদের জীবনকাহিনী গল্পচ্ছলে বলিতেন। অন্যান্য পুত্রকন্যা-গণ পলাইত, কিন্তু টেরেসা বসিয়া বসিয়া এই সকল একাগ্র মনে শুনিতেন। ভবিষ্যতে নিজে মহীয়সী সাধিকা হইবেন বলিয়াই বোধ হয় বাল্যে মহাপুরুষ-চরিত্র শুনিতে তাঁহার এত ভাল লাগিত।

মাতার ন্যায় টেরেসা সুন্দরী, দীর্ঘকায়া, ক্ষীণাঙ্গী, উজ্জ্বলনয়না, রসিকা, প্রফুল্ল ও হাস্যমুখী ছিলেন। বিয়াট্রিজের মৃত্যুর পরে টেরেসার এক বৈমাত্রেয় ভগ্নী মেরিয়া গৃহকর্ত্রী হইলেন। মেরিয়া টেরেসাকে ভালবাসিতেন না। টেরেসা মাতার অভাব পূরণার্থ পার্শ্ববর্তী গির্জায় যাইয়া খ্রীষ্টজননী মেরীর নিকট প্রার্থনা করিতেন, 'আপনি কৃপাপূর্বক আমার জননীর স্থান অধিকার করুন।' আকুল আন্তরিক প্রার্থনা নিশ্চয়ই ভগবানের কাণে পৌঁছে। কিছুদিন প্রার্থনার পর টেরেসা ভার্জিন মেরীর অস্তিত্ব ও আশ্বাস অনুভব করিলেন। মাতার অকাল মৃত্যুতে টেরেসা বিবাহের প্রতি বীতরাগ হইলেন। তাঁহার আজীবন অবিবাহিত থাকিবার সংকল্প সুদৃঢ় হইল। মেরিয়া ও ভগ্নীগণ বিবাহিতা হইলেন। ভ্রাতাগণ সৈন্যবিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। ১৫৩১ খ্রীঃ ষোল বৎসর বয়সে টেরেসা শিক্ষালাভার্থ অগাষ্টিনিয়ান কনভেণ্টে প্রেরিত হইলেন। কনভেণ্টে প্রথম আট দিন টেরেসা খুব অস্বস্তি বোধ করিলেন। নূতন পরিবেশে তিনি হঠাৎ সুখী হইতে পারিলেন না। ক্রমে নিয়মিত জীবনযাপন, প্রার্থনার জন্য ঘণ্টাধ্বনি, সন্ন্যাসিনীগণের ধীর স্থির পদবিক্ষেপ ও আহার ও অধ্যয়ন তাঁহার ভাল লাগিল। ডোনা মেরিয়া নাম্নী এক সন্ন্যাসিনীর সমধিক স্নেহে টেরেসার আধ্যাত্মিক ভাব উদ্দীপিত হইল। টেরেসা ক্রমে ক্রমে বহির্জগৎ ভুলিলেন। মেরিয়ার প্রেরণায় ঈশ্বরদর্শন তাঁহার জীবনের

প্রধান লক্ষ্য হইল। টেরেসা বলেন, 'আমি শীঘ্র মঠের ধর্মপ্রসঙ্গে আকৃষ্ট হইলাম।" ডোনা মেরিয়া কি মর্মস্পর্শী ভাবে ও ভাষায় ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন! মেরিয়া ছিলেন অসাধারণ পবিত্রতা ও বিবেচনার প্রতিমূর্তি। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি সংসারত্যাগের ও সন্ন্যাসিনী-জীবন যাপনের সংকল্প করেন এই খ্রীষ্টবাণী শ্রবণান্তে —'আহূত হয় অনেকে, কিন্তু মনোনীত হয় অল্পই।' অল্পসংখ্যক মনোনীতগণের মধ্যে গণ্য হইবার আগ্রহ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। মেরিয়ার পূত স্পর্শে টেরেসা খুল্লতাত ভগ্নীগণের ঐহিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইলেন। ব্রতোপবাস, প্রার্থনা ও ধর্মপ্রসঙ্গাদি তাঁহার দৈনিক কর্তব্যের অঙ্গীভূত হইল।*

পিতা যখনই বিবাহের প্রস্তাব করিতেন তখনই টেরেসা মানস চক্ষে স্বর্গগতা জননীর ভগ্ন স্বাস্থ্যের রুগ্ন হৃদয়বিদারক চিত্র দেখিতেন। পিতা বহু গুণবান্ রূপবান্ বরের সংবাদ আনিলেন। সেই সকল লোভনীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া পিতাকে স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি পত্নীত্ব কখনো বরণ করিবেন না। ঠিক এই সময়ে তাঁহার এক কঠিন অসুখ হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগনির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় টেরেসার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত হইয়া গেল। তিনি পিতৃগৃহে আনীত হইলেন। কিন্তু এখন বিশাল পিতৃগৃহ শূন্যপ্রায় শ্মশানতুল্য। মাতা স্বর্গগতা, ভ্রাতাগণ কর্মোপলক্ষে প্রবাসী, ভগ্নীগণ বিবাহিতা। গৃহে গভীর নীরবতা বিরাজমান। একমাত্র পিতার সঙ্গ রুগ্না কন্যার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈমাত্রেয় ভগ্নী মেরিয়ার কাছে তাঁহাকে পাঠাইবার জন্য পিতা প্রস্তাব করিলেন। টেরেসা সম্মতা হইলেন। পথে টেরেসা এক বৃদ্ধ খুল্লতাতের গৃহে কিছু কাল অবস্থান করেন। উক্ত খুল্লতাত বার্ধক্যে সাধুমহাপুরুষগণের জীবনী ও বাণী পড়িতে বা শুনিতে ভালবাসিতেন। টেরেসা খুল্লতাতকে ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন। ইহাতেই তিনি অশেষ সান্ত্বনা ও পরম শান্তি পাইলেন। তাঁহার মনের ঝড় থামিয়া গেল। তাঁহার জীবন-পথের গন্তব্য দিক্ নির্ণীত হইল। তিনি খুল্লতাতের গৃহ হইতে বৈমাত্রেয় ভগ্নীর কাছে যাইয়া তাঁহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করেন। টেরেসার শুভ সংকল্প শীঘ্র সিদ্ধ হইল। একুশ বৎসর বয়সে টেরেসা সন্ন্যাসিনী সাজিলেন।

সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণকালের কথা টেরেসা এইরূপে লিখিয়াছেন।—'আমি যখন

* বোষ্টন বেদান্ত কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত 'মেসেজ অব দি ইষ্ট' নামক ইংরাজি ত্রৈমাসিকের ১৯৪০ ১ম সংখ্যায় লোলা হেনেসের প্রবন্ধ দেখুন।

বেদীর সম্মুখে নতজানু হইলাম তখন একটী কোমল করুণ স্বর আমার কর্ণগোচর হইল।' সেই সুস্পষ্ট স্বর বলিলেন, 'আমি ঈশ্বর। যাহারা সংসারত্যাগপূর্বক আমার পদানুসরণ ও সেবা করে আমি তাহাদের পিতা ও রক্ষক। এই দৈববাণী শ্রবণে আমার হৃদয় আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আমার জীবনে সেই বিমলানন্দের অভাব আর কখনও হয় নাই।' টেরেসা প্রায়ই দৈবাদেশ শুনিতেন এবং জাগ্রত অবস্থায় তদনুযায়ী চলিতেন। ঈশ্বর এই সন্ন্যাসিনীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে জীবন-পথে চালিত করিলেন। পুনরায় তিনি যে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন তাহাতে দীর্ঘ আট মাস শয্যাশায়িনী ছিলেন। এই অসুখের ফলে তিনি তিন বৎসর আংশিক ভাবে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রহিলেন এবং সারা জীবন আর নীরোগ ও স্বাস্থ্যবতী হইতে পারেন নাই। আধ্যাত্মিক আনন্দের আতিশয্যে ভগ্ন স্বাস্থ্যের দুঃসহ ভার তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইল। উক্ত অসুখের পর তিনি একটী ধর্মগ্রন্থে এই সত্য পাঠ করেন যে, প্রার্থনার দ্বারাই ঈশ্বরদর্শন সম্ভব। তিনি প্রার্থনায় ডুবিলেন, নিরন্তর প্রার্থনার ভাবে তিনি নিমজ্জিত হইলেন। প্রার্থনার দ্বারাই তিনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করিলেন, ঈশ্বরের বাণী শুনিলেন, চিরতরে তাঁহার প্রাণ জুড়াইল। প্রায় একচল্লিশ বৎসর বয়সে, সম্ভবতঃ বিশ বৎসর সাধিকার জীবন যাপনের পর, তিনি সংসিদ্ধা হইলেন। পিতা আলোন্‌জো কন্যার আশ্রয় ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কন্যাই পিতার শান্তিদাতা পরিত্রাতা গুরু হইলেন। পিতা মৃত্যুকালে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কেন আমি সারা জীবন সন্ন্যাসী হই নাই?'

হিন্দু ধর্মে যাহাকে সমাধি বলে টেরেসার সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ হইয়াছিল। মনের সেই উচ্চ অবস্থায় সকল চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দৃষ্ট হয়। মঠে সমাগত নরনারীগণের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিবার জন্য টেরেসার নিত্য অনেক সময় ব্যয়িত হইত। একদিন তিনি দৈববাণী শুনিলেন, 'মানুষের সহিত কথা বলিও না, ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ কর।' তখন হইতে তিনি বাহিরের লোকজনের সহিত কথাবার্তা বন্ধ করিলেন। তাহাতে গির্জার পাদ্রীগণ রুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার দৈববাণী-শ্রবণ বিশ্বাস করিলেন না। টেরেসা বলিলেন, 'বাহ্য কর্ণে যে পার্থিব স্বর শ্রুত হয় দৈববাণী তদপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও পরিষ্কার। বাহ্য কর্ণ বন্ধ করিলেও সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হয়।' পাদ্রীগণ বিশ্বাস করিলেন না যে, টেরেসা সত্যই ঈশ্বরবাক্য শ্রবণ করেন। সংকীর্ণমনা সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিগণের সমালোচনায় যখন

তিনি সমাক্রান্ত তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, 'প্রিয়া পুত্রী, তুমি ভীতা হইও না। আমি তোমাকে কখনো ত্যাগ করিব না।' তখন সাধিকা পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'সমগ্র জগৎ আমাকে অবিশ্বাস ও অত্যাচার করিলেও আমি চিন্তা করি না।' চর্মচক্ষে নহে, ভাবনেত্রে তিনি ঈশ্বরদর্শন করিতেন, ঈশ্বরের সহিত কথা বলিতেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পাদ্রীগণের অনুরোধে তিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক বিকাশের ইতিবৃত্ত লিপিবন্ধ করেন।*

স্পেনের রাজবংশীয় এক মহিলার স্বামী-বিয়োগ হয়। মঠ-কর্ত্রীর আদেশে টেরেসা উক্ত পতিহীনা হতভাগ্য নারীকে সান্ত্বনা দানার্থ অন্যত্র গমন করেন। এই সুযোগে তিনি বহির্জগতের আচার ব্যবহার চালচলনের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিতা হন। আভিলায় ফিরিয়া তিনি আবার ধ্যানে দৈবাদেশ পাইলেন নূতন নারী-মঠ স্থাপনের জন্য। কারমেলাইট আদর্শকে অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত এবং চির দারিদ্র্যব্রত উজ্জ্বল রাখিয়া নূতন মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ব্রতধারিণীগণকে আহ্বান করিলেন। সুসিন্ধার সংকল্প অচিরে সুসিদ্ধ হইল। অদৃঢ়, অপটু দেহ লইয়া টেরেসা জগদ্ধিত সাধনে অগ্রসর হইলেন। মেদিনা দেল ক্যাম্পো, ভাল্লাদোলিদ, তোলেদো, সেগোভিয়া, ভালেন্স, বার্গস প্রভৃতি স্থানে তিনি ধর্মপ্রচার ও মঠস্থাপন করিলেন। সমগ্র স্পেনে তদনুভূত নব বাণী বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত এবং সমগ্র জগতে প্রতিধ্বনিত হইল। স্পেনের বাহিরেও টেরেসা স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার প্রভাবে পুরাতন স্ত্রীমঠগুলিও নবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইল। খ্রীষ্টান ধর্মজগতে টেরেসার প্রভাব এখনও প্রবল।

স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের নরনারীগণ টেরেসার নিকট আসিয়া নব ধর্ম-জীবন লাভ করিলেন। টেরেসার অনুভূতি ও বাণী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসবাদে যুগান্তর আনিল।

শ্রীরাধিকাপ্রমুখ ব্রজাঙ্গনাগণ, মীরাবাঈ ও অণ্ডালের মত টেরেসা ঈশ্বরকে, যীশু খ্রীষ্টকে পতিজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। ভাবমুখে তিনি খ্রীষ্টকে বলিতেন, 'তুমি আমার, আমি তোমার।' দেবপতির সহিত চির মিলনের জন্য তিনি ব্যাকুলা হইলেন। ১৫৮২ খ্রীঃ ৫ই অক্টোবর ৬৮ বৎসর বয়সে দেবপতির সহিত টেরেসা

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৪০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ফরাসী লেখক মারসেল সাউটনের প্রবন্ধ দেখুন।

চিরতরে মিলিতা হন। "হে আমার প্রভু! হে আমার প্রিয়! যে শুভ মুহূর্তের তরে, যে পুণ্য মিলনের জন্য আমি এত বৎসর ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করিতেছিলাম অবশেষে তাহা সমুপস্থিত। শীঘ্রই আমি দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইব। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।" ইহাই মৃত্যু-কালে টেরেসার মুখনিঃসৃত শেষ-বাণী। মৃত্যুর পরে তাঁহার মৃত দেহ হইতে এত উগ্র দিব্য সুগন্ধ নির্গত হইতেছিল যে, তাঁহার মঠের ক্রন্দনরতা সন্ন্যাসিনীগণ বাধ্য হইয়া কক্ষের জানালাগুলি খুলিয়া দেন উক্ত সুগন্ধে অভিভূত হইয়া পড়িবার ভয়ে। কবরস্থলে যে সকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিল তন্দর্শনে শবদেহকে ভূগর্ভস্থ কবর হইতে উত্তোলন করার ইচ্ছা কৌতূহলী পাদ্রীগণের হৃদয়ে বলবতী হইল। চাঁপা, পদ্ম, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধে মঠের ভজনালয় পরিপূর্ণ হইত। কখনো কখনো এমন এক সুগন্ধ মঠবাসিনীগণের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিত যাহা অপার্থিব, যাহা স্বর্গীয়, যাহা অপূর্ব। ধ্যান বা উপাসনার কালে মঠের কোন সন্ন্যাসিনী নিদ্রাচ্ছন্ন হইলে টেরেসার অশরীরী বাণী তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিত। মঠবাসিনীগণকে না জানাইয়া গোপনে কফিন স্থানান্তরিত করা স্থির হইল। তখন কবরে তিনটী আঘাত শোনা গেল। কবর উন্মুক্ত হইবার পরও পূর্ববৎ সুগন্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনীগণের আগমনের পূর্বেই শব-দেহ অপহৃত হয়। রিবেরা নামক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, 'যে বাহুটী স্কন্ধ হইতে ফাদার গ্রেসিয়ান দ্বারা কর্তিত হয় অন্যত্র সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, তাহাও পারিজাত পুষ্পবৎ সুগন্ধ বিকীর্ণ করিতে লাগিল।' জেসুট রিবেরা টেরেসার জীবনী-লেখক। টেরেসার মৃত দেহ স্পর্শ করার জন্য তাঁহার হাতে যে সুগন্ধ লাগিয়াছিল তাহা তিনি জলে ধুইয়াও দূর করিতে পারেন নাই। প্রায় এক পক্ষকাল সেই সুগন্ধ তাঁহার হাতে ছিল। ছিন্ন বাহুতে মৃগনাভি কস্তুরীর গন্ধ ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বারা লাগান হয়। কিন্তু, বাহুর সুগন্ধ কস্তুরী গন্ধ অপেক্ষাও তীব্র হইল। পোপের আদেশে টেরেসার মৃত দেহ এবং উহার কর্তিত বাহু এলবাস্থ মঠের সন্ন্যাসিনীগণকে প্রত্যর্পণ করা হয়।*

স্পেন দেশের উচ্চবংশজ নারী জাতির মহৎ আদর্শ সাধিকা টেরেসার জীবনে সম্যক্ বিকশিত। টেরেসা আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, 'বাল্যকাল হইতে আমি

---

* ঘটনাটী কুমারী ভি. স্যাকভিল ওয়েষ্টের প্রণীত The Eagle and the Dove পুস্তকে বিবৃত।

খ্রীষ্টভক্ত ছিলাম। খ্রীষ্টভক্তির জন্য কামভাব আমাকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই।' তিনি বলেন, 'পর্বতশিখর হইতে লোকে যেমন সমতল ভূমির দিকে তাকায় তদ্রূপ আমি সংসারকে ঘৃণার চক্ষে দেখি। লোকে আমার সম্বন্ধে কি বলে বা জানে তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। ঈশ্বরকৃপায় এই জীবন বা জগৎ আমার নিকট স্বপ্নবৎ মিথ্যা অনুভূত হয়। আমার সুখবোধ বা দুঃখবোধ নাই।'

একাদশ মণি

তাপসী রাবেয়া

তাপসী রাবেয়া ইসলামের শ্রেষ্ঠ সাধিকা। ইংলণ্ডের বিদুষী লেখিকা মার্গারেট স্মিথ রাবেয়ার বিস্তৃত জীবনী ও বহু উপদেশ ইংরাজি পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। ৭১১ খ্রীঃ তুরস্ক দেশের অন্তর্গত বাসোরা নগরে এক দরিদ্র মুসলমান বংশে রাবেয়ার জন্ম হয়। তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য ছিল। তিনি বিবাহযোগ্যা ও বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহার মাতাপিতা দেহত্যাগ করেন। সেই সময় বাসোরা নগরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং রাবেয়া আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এই অসহায় গৃহহীনা সুন্দরী যুবতী ঘটনা-স্রোতে বাগদাদে গমন করিতে বাধ্য হন। দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত সহরে পথ হারাইয়া তিনি দুর্বৃত্তের হস্তে পতিতা হন। এই দুর্বৃত্ত কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে রাবেয়াকে এক ধনবান্ মালিকের নিকট বিক্রয় করে।

নিষ্ঠুর মালিক দাসী রাবেয়াকে সারা দিন এত কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত রাখিতেন যে, তিনি আদৌ বিশ্রামের সময় পাইতেন না। তদুপরি গৃহস্বামীর দুর্ব্যবহার এবং দুর্বাক্যও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত। দারিদ্র্য ও দুঃখই মানবের চরম শিক্ষক। রাবেয়া ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং ভক্তিমতী ছিলেন। ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মবিশ্বাসের বলেই তিনি এই দুর্বিষহ দুঃখ-কষ্ট অম্লান মুখে সহ্য করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে গৃহের সকলে যখন সুষুপ্ত তখন তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠে এবং উপাসনায় বসিতেন। এক গভীর রজনীতে হঠাৎ গৃহস্বামী জাগ্রত হইয়া শুনিলেন, রাবেয়া কাতর কণ্ঠে কিছু বলিতেছেন। তিনি নীরবে রাবেয়ার নিভৃত কুটীরের পার্শ্বে যাইয়া দেখিলেন, রাবেয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনারত। রাবেয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, 'হে প্রভু! হে দয়াময়! একমাত্র তুমিই আমার সহায় এবং আমার হৃদয়ের অভিলাষ জান। তোমার চিন্তায় যদি দিবানিশি থাকিবার সুযোগ পাইতাম তবে তাহাতেই আমার পরমানন্দ হইত। আমাকে তুমি পরাধীনা দাসী করিয়াছ। সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রমের পরে রাত্রির বিশ্রামকালে তোমাকে ডাকি। তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় না। আমার এমন সুযোগ ও অবসর

কি হইবে যখন তোমার চিন্তায় অহর্নিশি ডুবিয়া থাকিতে পারিব?'

নিস্তব্ধ নিশীথে রাবেয়ার এই করুণ আত্মনিবেদন ও উপাসনা শ্রবণে গৃহ-স্বামী স্তম্ভিত হইল। তাহার পাষাণ-হৃদয় গলিয়া গেল। সে দেখিল, রাবেয়ার শিরোদেশ দিব্যালোকে মণ্ডিত এবং সেই আলোকচ্ছটায় তাঁহার কুটীর সমুজ্জ্বল। এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে তাহার মনোভাব পরিবর্তিত হইল। সে বুঝিল, যাঁহাকে এতকাল সে স্বীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিয়াছে, তিনি মহাতাপসী। সে পরদিবস রাবেয়াকে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে দাসীত্ব হইতে বিমুক্ত করিয়া বলিল, 'আপনি এখন হইতে স্বচ্ছন্দে ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন। আপনি আমার গৃহে থাকিয়াও উপাসনাদি ঈপ্সিত কর্ম করিতে পারেন। তাহা হইলে আমি দাস হইয়া আপনার সেবা করিয়া ধন্য হইব।' রাবেয়া গৃহস্বামীকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া তপস্বিনীর বেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আরবের মরুভূমিতে তিনি বংশীবাদন করিয়া বেড়াইতেন। নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল পর্য্যটনে তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হইল। তৎপরে তিনি কোন নির্জন স্থানে একটী কুটীরে তপস্যায় বসিলেন। তপশ্চর্য্যাকালে তিনি কাহারো সহিত কথা বলিতে বা দেখা করিতে চাহিতেন না। কুটীরের মেজের উপর একখানি ছিন্ন মাদুর পাতিয়া ইঁট মাথায় দিয়া তিনি শুইতেন। জলপানের জন্য তাঁহার একটী ভগ্ন মৃৎপাত্র ও পরিধানের জন্য ছিন্ন বস্ত্র ছিল।

রাবেয়ার দিব্য রূপরাশির মোহে বহু ভোগী ও যোগী আকৃষ্ট হইল। শোনা যায়, সাধক হাসান তাঁহার পাণিগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাবেয়া উক্ত প্রস্তাবে অস্বীকৃতা হন। পরিণয়প্রার্থী আর একজনকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'রে কামুক! তোর মত আর একটীকে অন্বেষণ কর্। তুই কি আমার মধ্যে কামের কোন চিহ্ন দেখেছিস্?' লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতে ভালবাসিতেন। কিছুকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে তিনি নির্জন অরণ্যে যাইয়া যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হন। তাঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল শক্তি তিনি প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। একদিন তাপস হাসান স্বীয় মাদুরটী জলে ভাসাইয়া উহার উপর বসিলেন এবং রাবেয়াকে ডাকিলেন, তাঁহার পার্শ্বে জলোপরি মাদুরে বসিয়া ধ্যান করিতে। রাবেয়া মৃদু হাস্যে তাঁহাকে বলিলেন, 'নিজেকে এরূপ ভাবে বাজারে জাহির করিও না।' ইহা বলিয়া তিনি

স্বীয় মাদুরটী শূন্যে উড়াইলেন এবং তদুপরি বসিয়া হাসানকে বলিলেন, 'এস, এখানে আমার পাশে বসিয়া উপাসনা কর।' হাসানের সেই শক্তি ছিল না। বৃথা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য হাসান লজ্জিত হইলেন। তখন রাবেয়া হাসানকে বলিলেন, 'তুমি যাহা দেখাইলে তাহা একটী মাছ করিতে পারে। আর, আমি যাহা দেখাইলাম তাহা একটী পাখী অনায়াসে করিতে পারে। প্রকৃত সাধনার সহিত এই শক্তির সম্বন্ধ নাই। ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তশুদ্ধি, ঈশ্বরপ্রেম, বিবেক, নিঃস্বার্থ সেবা ও বৈরাগ্যই সাধকের বা সাধিকার অমূল্য সম্পদ ও অসীম শক্তি।'

রাবেয়ার শেষ জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর অশ্রুপাত, উপাসনা ও উপবাসাদি দ্বারা তিনি তপস্যা করেন। তপস্যার তাপে তাঁহার দেহ জরাগ্রস্ত, জীর্ণশীর্ণ ও কঙ্কালসার হইয়া পড়িল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেন, 'হে প্রভো! যদি একবারটি আমাকে দর্শন দাও, আমার জীবন সার্থক হয়।' প্রার্থনার উত্তরে তিনি প্রায়ই শুনিতেন, 'তোমার পূর্বে আর একজন আমাকে ডাকিয়া পাইয়াছে। আমার কৃপাকণায় সিনাই পর্বত ফাটিয়া যায় এবং সাধক সমাধিস্থ হয়। আমার নামোচ্চারণে সন্তুষ্ট থাক।' কঠোর সাধনার ফলেই রাবেয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনলাভে ধন্যা হন। তিনি রাত্রে ঘুমাইতেন না। রাত্রিতে যখন জগতের কোলাহল স্তব্ধীভূত, তখন তিনি জাগিয়া উপাসনা করিতেন।

সাধন-বলে রাবেয়া এত প্রেম, পবিত্রতা, ও দিব্য ভাবের অধিকারিণী হইয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহার নামটি শুনিলে শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করিত। তাঁহার দর্শনলাভ ও উপদেশ শ্রবণের জন্য সুদূর স্থান হইতে বহু লোক সমাগত হইত। সকলেই তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া এবং তাঁহার শান্তিপ্রদ বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া ফিরিত। একদা এক সাধক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনার কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয়?' তাহাতে সাধিকা উত্তর দিয়াছিলেন, 'আপনি শরীরের বিবাহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? এই শরীর ত আমার নহে। এই দেহ ঈশ্বরচরণে সমর্পিত। ইহা তাঁহার আজ্ঞাধীন, তাঁহার কার্যে নিযুক্ত।' একদা এক বসন্ত ঋতুতে তাপসী রাবেয়া স্বীয় কুটীরে স্থিরভাবে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিচারিকা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, 'আর্যে, একবার বাহিরে আসিয়া প্রকৃতির মনোহর শোভা দেখুন।' সাধিকা উত্তর দিলেন, 'তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার সৌন্দর্য দেখ।' সৃষ্টির সৌন্দর্য দর্শনে যদি স্রষ্টাকে স্মরণ

না হয় তবে সেই দর্শন বৃথা। কেহ একবার তাপসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহাকে কি দেখিতে পান?' তৎক্ষণাৎ তাপসী উত্তর দিলেন, 'তাঁহাকে না দেখিলে কখনই তাঁহার উপাসনা করিতাম না।'

একবার কোন ব্যক্তি মস্তকে পটী বাঁধিয়া রাবেয়ার নিকট উপস্থিত হয়। রাবেয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি মাথায় পটী বাঁধিয়াছ কেন?' লোকটি বলিল, 'আমার মাথা ধরিয়াছে, তাই মাথায় পটী বাঁধিয়াছি।' রাবেয়া—'তোমার বয়স কত?' লোকটি—'ত্রিশ বৎসর।' রাবেয়া—'এতকাল সুস্থ ছিলে, না অসুস্থ ছিলে?' লোকটি—'এত বৎসর সর্বদা সুস্থই ছিলাম।' রাবেয়া তখন লোকটিকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'এত অধিককাল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন মস্তকে বাঁধিলে না, আর একদিন যখনই অসুস্থ হইয়াছ তখনই গ্লানির চিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়াছ?' একটি যোগী একবার রাবেয়ার নিকট আসিয়া সংসারের দুঃখকষ্টের কথা বলিতে আরম্ভ করেন। রাবেয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি অত্যন্ত সংসার-প্রেমিক। যদি আপনি সেরূপ না হইতেন তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া কখনো সংসারের কথা বলিতেন না। যিনি সংসারবিরাগী তিনি সংসারের ভালমন্দ ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবেন কেন? যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার কথাই বেশী বলে।'

রাবেয়া অনুক্ষণ আর্তনাদ করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিত, 'আপনি সদা আর্তনাদ করিতেছেন কেন? আপনার কি কোন অসুখ করেছে?' সাধিকা উত্তর দিতেন, 'হাঁ, আমার পীড়া হয়েছে, হৃদয়ের পীড়া। সংসারের কোন চিকিৎসক সেই পীড়ার ঔষধ জানে না। ঈশ্বরদর্শন আমার পীড়ার একমাত্র মহৌষধ।' রাবেয়ার মত মীরাবাঈ গাহিতেন—

দরদ কি মারী বন বন ডোলু, বৈদ মিলো নাহি কোয়।
মীরাকে প্রভু পীড় মিলই যব, বৈদ শ্যাঁমলিয়া হোয়॥

অর্থাৎ হৃদয়ের ব্যথায় পাগল হইয়া আমি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু এই ব্যথার বৈদ্য পাইতেছি না। মীরার এই পীড়া সারিয়া যায়, যদি শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্য-রূপে আসেন।

রাবেয়া তাঁহার পীড়ার পরম ঔষধ পাইয়াছিলেন। তিনি জীবনের শেষভাগ দিবারাত্রি ঈশ্বরানন্দে বিভোর থাকিতেন। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই তাঁহার পূত সঙ্গ লাভে কৃতার্থ হইত। শেষ জীবনে তিনি মক্কায় থাকিতেন। নব্বই বৎসর

বয়সে ৮০১ খ্রীঃ তিনি মক্কায় তনুত্যাগ করেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন। দারিদ্র্য ও কৌমার্য তাঁহার অঙ্গভূষণ ছিল। কেহ অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলে সাধিকাসুলভ বাক্যে তিনি বলিতেন, 'দারিদ্র্যের জন্য কি ঈশ্বর দরিদ্রকে বিস্মৃত হইবেন? ধনের জন্য কি তিনি ধনীকে স্মরণ করিবেন?' এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলিতেন, 'এই বিশ্ব যাঁহার সৃষ্টি তাঁহার কাছে ঐহিক সম্পদ চাহিতে আমার লজ্জা হয়। ঐহিক কোন বস্তুই মানুষের নহে, সবই ঈশ্বরের। সুতরাং মানুষের কাছে চাহিয়া কি লাভ? যিনি অবিশ্বাসীকেও প্রতিপালন করেন তিনি কি এই শরণাগত সেবিকাকে রক্ষা করিবেন না?' তাঁহার বন্ধু সুফিয়ানকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণই আমার জীবনব্রত। আমার দুঃখ কষ্ট কি তাঁহার ইচ্ছায় আসিতেছে না? যদি তাহাই হয় তবে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইব কেন? তিনি আমার প্রিয়তম এবং তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলময়।'

তাপসী রাবেয়া একমাত্র মুক্তি চাহিতেন, স্বর্গ কামনা করিতেন না। তিনি প্রার্থনা করিতেন, 'হে প্রভু, তোমাকে যদি নরকের ভয়ে ডাকিয়া থাকি তবে আমাকে নরকে নিক্ষেপ কর। যদি স্বর্গের জন্য তোমাকে ডাকি, তবে আমাকে স্বর্গে যাইতে দিও না। আর যদি তোমার জন্য তোমাকে ডাকি, তাহা হইলে তোমার অসীম সৌন্দর্য দর্শন হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।' রাবেয়ার সমগ্র জীবন নির্জনে অতিবাহিত। তিনি নিঃসঙ্গ জীবন ও নির্জন বাস খুব পছন্দ করিতেন। নির্জনে তিনি প্রার্থনা করিতেন, 'হে প্রভু, তারকারাজি আকাশে বিরাজমান। মানবচক্ষু নিদ্রায় স্তিমিত। রাজপ্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ। রাজপুরুষগণ, প্রাসাদবাসিগণ স্ব স্ব প্রেমিকার সহিত অবস্থিত। আমি একাকিনী তোমার চরণতলে উপবিষ্ট।'

রাবেয়া ঈশ্বরপ্রেমে সদা পরিপূর্ণ থাকিতেন। তিনি ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ব্যতীত মহম্মদপ্রমুখ কোন মহাপুরুষের কথাও বলিতেন না। একদিন জনৈক মুসলমান সাধক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি মহম্মদকে ভক্তি করেন না?' রাবেয়া উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই। আমি তাঁহাকে গভীর ভক্তি করি। কিন্তু স্রষ্টার প্রেম আমাকে সৃষ্ট প্রাণীর প্রেম হইতে বিমুখ করিয়াছে। আমি ঈশ্বরপ্রেমে এত পূর্ণ এবং ঈশ্বর-চিন্তায় এত মগ্ন যে, অন্য কাহারো প্রতি প্রেম বা ঘৃণার স্থান আমার হৃদয়ে নাই।' রাবেয়ার মতে ঈশ্বর ও সাধিকার মধ্যে কোন মধ্যস্থ ব্যক্তি বা গুরুর প্রয়োজন নাই। সাধিকা যেন পূর্ব বন্ধনসমূহ ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আর নূতন প্রীতিবন্ধন সৃষ্টি

না করেন। তাহা হইলেই ঈশ্বরের সহিত অচিরে তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।

রাবেয়ার জীবন-সঙ্গীত এই।—'হে মানব, তুমি যাহা ভালবাস তাহাই হইয়া যাও। ঈশ্বরকে ভালবাসিলে তুমি ঈশ্বরময় হইবে। আর সংসারকে ভালবাসিলে তুমি ধূলিময় হইবে। সুতরাং হৃদয়ের প্রেম ঈশ্বরে অর্পণ কর, সংসারে ঢালিও না।' রাবেয়া হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ঈশ্বরে দিয়া ঈশ্বরময়, আল্লাময় হইয়াছিলেন। মুসলমান নারীর শাশ্বত আদর্শ রাবেয়ার জীবনে মূর্ত।

দ্বাদশ মণি

সেণ্ট কাথারাইন

ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ে সেণ্ট কাথারাইন নামে ছয়টী সাধিকা সুপ্রসিদ্ধা। আলেকজান্দ্রিয়া, সুইডেন, বোলোগ্না, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স ও সিয়েনা— এই ছয়টী স্থানে ছয়টী সাধিকার আবির্ভাব হয়। সিয়েনার সেণ্ট কাথারাইনের কথা এই অধ্যায়ে বিবৃত। সেণ্ট ফ্রান্সিসের ন্যায় তাঁহার পদদ্বয়ে, হস্তযুগলে এবং হৃদয়ে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের ক্ষতবৎ ক্ষত হইয়াছিল। তিনি চিরকৌমার্য্যব্রতধারিণী এবং মাত্র তেত্রিশ বৎসর জীবিতা ছিলেন।

কাথারাইন বেনিনকাসা ইটালী দেশের সিয়েনা নামক স্থানে ১৩৪৭ খ্রীঃ ২৫শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সাধারণ বস্ত্ররঞ্জনকারী ছিলেন। জীবিকা অর্জনে এবং পরিবারবর্গ প্রতিপালনে তাঁহার দিন কাটিত। কাথারাইনের মাতা কবি সিউজিও পিয়াজেণ্টির কন্যা ছিলেন। মাতা পিতা অপেক্ষা অধিকতর রুক্ষস্বভাবা ও দৃঢ়-সংকল্পা ছিলেন। কাথারাইন মাতাপিতার কনিষ্ঠা কন্যা। সাত বৎসর বয়সে ভ্রাতা স্টেফানোর সহিত গৃহে ফিরিবার পথে তাঁহার প্রথম অলৌকিক দর্শন লাভ হয়। প্রচারকারী পাদ্রীগণের গির্জার উপরে আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া বালিকা দেখিলেন, সুসজ্জিত বিবাহকক্ষে বিশ্বত্রাতা প্রিয়দর্শন বর যীশুখ্রীষ্ট রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার পার্শ্বে পিটার, পল এবং জন প্রভৃতি শিষ্যগণ বিরাজমান। ইহা দেখিয়া কাথারাইন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নির্নিমেষ নয়নে পরম প্রেমে যীশুখ্রীষ্টের দিকে তাকাইলেন। তখন আকাশস্থিত জ্যোতির্ময় পুরুষ প্রেমপূর্ণ সহাস্য বদনে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত কাথারাইনের মস্তকোপরি প্রসারণ-পূর্বক তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। এই দিব্য আশীর্বাদের ফলে লজ্জাশীলা বালিকার হৃদয় সাহসে পরিপূর্ণ হইল। তিনি রাজপথের মধ্যে ঊর্ধ্ব নয়নে পশুসমূহ ও মানবগণকে উপেক্ষা করিয়া দৃষ্ট দিব্য পুরুষের সহিত একাত্মবোধ অনুভব করিলেন। স্টেফানো ইতিমধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, ভগিনী তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু যখন তিনি পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ভগিনী বহুদূরে ঊর্ধ্বমুখে নিষ্পন্দভাবে দণ্ডায়মানা তখন তিনি কয়েকবার চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। কিন্তু যখন

তিনি কোন উত্তর বা সাড়া পাইলেন না তখন তিনি ফিরিয়া ভগিনীর নিকটে যাইয়া পূর্ববৎ চীৎকার করিয়া ডাক দিলেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না। শেষে তিনি ভগ্নীর হাত ধরিয়া টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আস্‌ছ না কেন? এখানে কি কর্‌ছ?" তখন কাথারাইনের যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঊর্ধ্বদিক হইতে দৃষ্টি নামাইয়া তিনি বলিলেন, "আহা! আমি যা দেখ্‌ছি তা তুমি যদি দেখতে, আমাকে এমন সুন্দর দর্শন হ'তে টেনে নামাতে না।" ইহা বলিয়া তিনি পুনরায় আকাশের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু তখন সেই দিব্য পুরুষ অন্তর্হিত। উক্ত দর্শনের অভাবে অধীর হইয়া তিনি অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "কেন আমি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম?" এত অল্পবয়সেই কাথারাইনের জীবনাকাশে আধ্যাত্মিক রবি উদিত হইত। *

বার বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনের দারুণ সংগ্রাম ও সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। সেই কালের প্রথা অনুসারে মাতা কন্যার জন্য একটী উপযুক্ত বরের সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং কন্যাকে তজ্জন্য কেশরঞ্জন ও উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিতে বলিলেন। কিন্তু কন্যা মাতার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি একদিন তাঁহার সুন্দর সুদীর্ঘ কেশ কাটিয়া ফেলিলেন। এই কর্ম দ্বারা বালিকার বিবাহে অনিচ্ছা ও সংসার-বৈরাগ্য সূচিত হইল। মাতা কন্যার কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কঠিন গৃহকর্মে এমনভাবে নিযুক্ত রাখিলেন যাহাতে তিনি উপাসনা ও নির্জনতার অবসর না পান। কিন্তু উচ্চতম লক্ষ্যে মন নিবদ্ধ হইলে কোন সাংসারিক বাধা জীবনের অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারে না। মাতার প্রতিকূল আচরণ সত্ত্বেও কন্যা নিরুৎসাহ বা পশ্চাৎপদ হইলেন না। প্রতিহত জলস্রোত যেমন প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয় তেমনি সাধিকার সংকল্প বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দৃঢ়তর হইল। নম্রতা ও ধৈর্য্য সহায়ে অচিরে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রান্ত হইল।

১৩৬৩ খ্রীঃ কাথারাইন সেণ্ট ডোমিনিক সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। উক্ত সম্প্রদায়ের একটী গির্জা আছে সিয়েনা পর্বতের উপরে। এই গির্জার প্রচারকগণের প্রবল প্রভাব ছিল বস্ত্ররঞ্জক জাতির উপর। প্রচারকগণ সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হইতেন না। তাঁহারা আত্মোন্নতির জন্য স্বগৃহে খ্রীষ্টের উপদেশ পালন ও প্রচার

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৩৯ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত জার্মান লেখক ওলফ্রাম এইচ. ককের প্রবন্ধে ঘটনাটী বিবৃত।

করিতেন। সুতরাং কাথারাইন গৃহত্যাগ করিলেন না। তিনি স্বগৃহের এক ক্ষুদ্র কক্ষে দরিদ্রভাবে থাকিয়া উপবাস, উপাসনা, ধর্মগ্রন্থ শ্রবণাদিতে ব্যাপৃতা রহিলেন। অনেক পরে তিনি লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সেবাদি সৎকর্ম, উপাসনা ও ধর্মগ্রন্থপাঠ করিতে সকলকে উপদেশ দিতেন। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথমাবস্থায় তাঁহাকে পশুভাব ও প্রলোভনের বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রাম করিতে হয়। কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের কৃপায় এবং স্বীয় সাধনার বলে তিনি বিজয়লাভ করেন। কার্নিভাল নামক উৎকৃষ্ট আনন্দোৎসব রোমনগরে প্রত্যেক বৎসর হইত। হিন্দুদের দোলযাত্রার ন্যায় ইহা ক্যাথলিক খ্রীষ্টান পর্ব বিশেষ। এই উৎসব উপলক্ষে নাগরিকগণ যখন নির্লজ্জভাবে ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত তখন পুনরায় কাথারাইন খ্রীষ্টের দর্শন লাভ করেন ১৩৬৬ এবং ১৩৬৭ অব্দের মধ্যে প্রায় বিশ বৎসর বয়সে। এই দর্শনে দেবপতির আশ্বাস ও আশীষ লাভে তিনি পরমানন্দিতা হন।

এই দর্শনের সময় বংশীধ্বনি সহযোগে এবং কুমারী মেরীর সমক্ষে খ্রীষ্ট কাথারাইনের আংগুলে একটী জ্যোতির্ময় আংটী পরাইয়া দেন। সেই আংটী কেবল কাথারাইনের দৃষ্টিগোচর ছিল, অন্য কাহারো নহে। এই অনুভূতিই সাধিকার প্রাণবায়ুরূপে পরিগণিত। খ্রীষ্টের সহিত কাথারাইনের পরিণয়ের ইহাই প্রথম চিহ্ন। দেহত্যাগান্তে কন্যা বরের সহিত চিরমিলন লাভ করিলেন। কাথারাইনের আংটী পরিধান ইটালীয় কবিশিল্পিগণের একটী প্রিয় বিষয়।

কাথারাইনের প্রতি অনুরক্ত নরনারীগণ সংঘবদ্ধ হইয়া একটি সম্প্রদায় গঠন করিলেন। এই সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী ১৩৬৮ খ্রীঃ লিপিবদ্ধ হয়। ইহার দুইটী প্রধান কেন্দ্র হইল কাথারাইনের স্বগৃহ এবং সিয়েনার সান্তা মেরিয়া ডেলা স্কালা হাসপাতালের কাপেলা ডেলা ভল্টে। সিয়েনা রিপাবলিকের সভ্য, দূত ও কর্মচারী এবং সর্ব শ্রেণীর নরনারী, শিল্পী ও কবি এবং পার্শ্ববর্তী মঠ ও আশ্রমের সাধু ভক্তগণ এই নব সংঘে যোগদান করিলেন। কাথারাইনের অলৌকিক দর্শন, বিশুদ্ধ জীবন এবং কঠোর সাধন ও সেবা সকলকে আকৃষ্ট করিল। বিশ বৎসর বয়সের যুবতী সাধিকা স্বীয় সাধনবলে কিরূপে স্বীয় নগরের ধর্মগুরু হইলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অসীম দিব্য শক্তির অধিকারিণী না হইলে তিনি এইরূপ দুঃসাধ্য কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। সাধিকার পবিত্র প্রভাবে সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীগণের দৈনন্দিন জীবন আধ্যাত্মিক আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল।

১৩৭৪ খৃীঃ সিয়েনা নগর ব্যাপকভাবে প্লেগ মহামারী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তখন কাথারাইন শিষ্যবর্গ ও অনুচরগণ সহ নগরবাসিগণের সেবায় প্রাণ পণ করেন। রোগীসেবা ও ঔষধপথ্য দানাদি তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাগণ নিত্যকর্মজ্ঞানে অনুষ্ঠান করিতেন। নিঃস্বার্থ সপ্রেম সেবা এক প্রকার শ্রেষ্ঠ সাধন। এই সাধন দ্বারা চিত্তের মলিনতা বিধৌত হইলে আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব হয়। তখন খৃীষ্টান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপ মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সম্প্রদায় মতভেদহেতু দুই দলে বিভক্ত হয়। ষড়যন্ত্রের দ্বারা পোপকে রোম ছাড়িয়া আভিগ্ননে যাইতে হয়। পোপকে রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং দুই দলকে একীভূত করা এবং ষড়যন্ত্রকারিগণের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করাই তখন কাথারাইনের প্রধান সাধন হইল। পিসার শাসকের আমন্ত্রণে তিনি ১৩৭৫ খৃীঃ উক্ত নগর পরিদর্শন করেন। ধর্মযুদ্ধের জন্য পিসাবাসিগণের উৎসাহ জাগ্রত করা এবং তাহাদিগকে পোপের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে নিবৃত্ত করাই ছিল তাঁহার পিসাগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে সম্মিলিত ও সঞ্জীবিত করিবার আগ্রহে তিনি পিসায় গভীর প্রার্থনা ও ধ্যানে ডুবিলেন। ইহার ফলে ১৩৭৫ খৃীঃ ১লা এপ্রিল সেণ্ট ফ্রান্সিসের মত তিনি ক্রুশবিদ্ধ খৃীষ্টের ক্ষতচিহ্নগুলি স্বীয় হস্তদ্বয়ে, পদযুগলে ও বক্ষে পাইলেন। কিন্তু প্রার্থনার দ্বারা সেই চিহ্নগুলি অদৃশ্য হইয়া রহিল। কাথারাইন খৃীষ্টের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইলেন। সাধিকা ক্রাইস্টের স্বরূপতা লাভ করিলেন।*

১৩৭৬ খৃীঃ কাথারাইন ফ্লোরেন্সবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার্থ আভিগ্ননে পোপের নিকট গমন করেন। ১৮ই জুন তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু একদল ফ্লোরেন্সবাসী তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অবশ্য তাঁহার গমন একেবারে নিষ্ফল হইল না। তাঁহার প্রার্থনায় পোপ গ্রেগরী রোমে ফিরিতে সম্মত হন। দুঃখের বিষয়, গ্রেগরী ১৩৭৮ খৃীঃ দেহত্যাগ করেন। তখন ষষ্ঠ আরবান পোপের আসনে আরূঢ় হন। গ্রেগরীর সহিত কাথারাইনের বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁহার চেষ্টায় ফ্লোরেন্সের সহিত পোপের পুনরায় মিত্রতা স্থাপিত হয়। তখন কাথারাইন রাজনৈতিক কর্মে বিরক্ত হইয়া নির্জনবাস আরম্ভ করেন। এই নির্জনবাসে তিনি ধ্যানে ঈশ্বরবাণী শুনিয়া

* ই. জি. গার্ডেনার প্রণীত এবং ১৯০৭ খৃীঃ প্রকাশিত পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া যান এবং অন্য একজন তাহা লিখিয়া রাখেন। ১৩৭৮ খ্রীঃ এই পুস্তক সমাপ্ত হয়। ইহাই সেণ্ট কাথারাইনের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ১৩৮০ খ্রীঃ এপ্রিলের শেষে মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে রোমে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শিষ্য ও সহচর ফ্রা রেমেণ্ডো ১৩৮৪ হইতে ১৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার যে বিস্তৃত জীবনী লাটিন ভাষায় রচনা করেন উহার নাম ভিটা বা লেজেণ্ডা। এই বিখ্যাত গ্রন্থ কোলন হইতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫৫৩ খ্রীঃ। ইহা ইউরোপের প্রধান ভাষা-সমূহে অনূদিত হইয়াছে। সেণ্ট কাথারাইনের চারিশত পত্র এবং ছাব্বিশটি প্রার্থনাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত। এই বইগুলি ইটালীয় ধর্মসাহিত্যে সমুন্নত স্থান অধিকার করিয়াছে এবং যুগান্তর আনিয়াছে।

নির্দোষ যুবক নিকলো ডা তুল্ডো তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। বিনা অপরাধে যুবকটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কাথারাইন উন্মত্ত যুবককে সস্নেহে সুযত্নে সেবাশুশ্রূষা করেন। এমন সময় যুবকের মস্তক কর্তিত হইয়া কাথারাইনের হস্তে পতিত হয়। রক্তের ছিটায় সাধিকার হস্তপদ বিলিপ্ত হইয়াছিল। নিকলো ডা তুল্ডো 'যিশু এবং কাথারাইন'—এই নাম দুটি উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। কাথারাইনের কৃপায় শত শত নরনারীর জীবনে আধ্যাত্মিক আলোক জ্বলিয়াছিল। পদ্ম ফুলের ন্যায় তিনি অল্পায়ু ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, দিব্য দর্শনাদিতে খ্রীষ্টান কাথলিক ধর্মেতিহাসে এক নূতন অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরপদে উৎসর্গীকৃত জীবন ধ্যান, উপাসনা ও সেবায় পূর্ণ হয়। সেণ্ট কাথারাইনের সাধনাময় সেবাময় জীবন হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই। নারী-জীবন শুধু বিবাহ, সন্তানপালন, পতিসেবা ও গৃহকর্মে পর্যবসিত হইলে সার্থক হয় না। পুরুষের ন্যায় নারীও সমানভাবে ধর্মসাধন ও ধর্মপ্রচার করিতে সমর্থ।

সেণ্ট কাথারাইনের মতে ব্রহ্মচর্য পালন ব্যতীত ধর্মজীবন অসম্ভব। কামই প্রধানতঃ আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে। তিনি বলেন, "কামের মত ভীষণ শত্রু সাধক বা সাধিকার আর নাই। কামের প্রভাবেই আমরা দিব্যালোক হইতে বঞ্চিত হই। দার্শনিকগণ এই ধ্রুব সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা ব্রহ্মচর্য পালনে (অর্থাৎ বীর্যধারণে) এত যত্নশীল হইতেন। ব্রহ্মচর্য-বলেই তাঁহারা গভীর অধ্যয়ন ও মৌলিক গবেষণা করিতে পারিতেন"। সেণ্ট কাথারাইনের মতে আমরা যতই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হই ততই শক্তিশালী ও সমুন্নত হই। তিনি

বলেন, "যেমন মৎস্য সমুদ্রে এবং সমুদ্র মৎস্যে অবস্থিত তেমনি মানুষ ঈশ্বরে এবং ঈশ্বর মানুষে বাস করেন"। তাঁহার জন্মভূমি সিয়েনা অনুর্বর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এবং অশ্যামল পর্বতে পরিবেষ্টিত হইলেও সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যের সোণালী কিরণে সুশোভিত হয়। তেমনি তাঁহার জীবন কঠোর তপশ্চর্যায় পূর্ণ হইলেও আধ্যাত্মিক আলোকে সমুজ্জ্বল। সেবা এবং সাধনাই শান্তি ও সৌন্দর্যের উৎস।

ত্রয়োদশ মণি

সন্ন্যাসিনী গৌরীপুরী

উত্তর কলিকাতায় শ্যামবাজার পল্লীতে রাণী হেমন্ত কুমারী ষ্ট্রীটের ছাব্বিশ সংখ্যক নবনির্মিত ত্রিতল ভবনে সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু বালিকাবিদ্যালয় অবস্থিত। আশ্রমের দরজার পাশে শ্বেত পাথরে লেখা আছে, 'সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতা প্রতিষ্ঠিত'। ইহাই সন্ন্যাসিনী গৌরীপুরীর অক্ষয় কীর্তি। পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে গৌরীপুরী এই আশ্রমটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে সন্ন্যাসিনী মঠ ও বালিকাবিদ্যালয় বর্তমান। গৌরীপুরী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসিনী শিষ্যা এবং 'গৌরী মা' নামে পরিচিতা। শ্রীগুরুর নির্দেশেই তিনি নারীশিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার আশ্রমে হিন্দু বালিকাগণ সন্ন্যাসিনীগণের সংসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীরূপে থাকিয়া ধর্ম ও বিদ্যা শিক্ষা করে। এই আশ্রম হইতে গৌরী মার একটি বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্বাশ্রমে গৌরী মার নাম ছিল মৃড়ানী বা রুদ্রানী। সম্ভবতঃ ১৮৫৭ খৃীঃ মৃড়ানীর জন্ম হয়। সেদিন নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ জন্মদিন। তাঁহার পিতা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় হাওড়া জেলার অন্তর্গত শিবপুরের অধিবাসী ছিলেন। পার্বতীচরণের মাতৃভক্তি, ধর্মনিষ্ঠা ও তেজস্বিতা অসাধারণ ও অনুকরণীয় ছিল। মৃড়ানীর মাতা গিরিবালা দেবী বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্না ও সুগায়িকা ছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতাবলী ও স্তবগুলি বহুকাল পূর্বে 'নামসার' এবং 'বৈরাগ্যমালা' নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পার্বতীচরণ ও গিরিবালার দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। মৃড়ানী তাঁহাদের দ্বিতীয়া কন্যা ও চতুর্থ সন্তান। গিরিবালার কোন ভ্রাতা না থাকায় মাতার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানার্থ তাঁহাকে ভবানীপুরে পিত্রালয়ে জীবনের অধিকাংশকাল কাটাইতে হয়। সেইজন্য মৃড়ানী ভবানীপুরে মাতুলালয়ে বাল্যাবধি লালিতা-পালিতা ও শিক্ষিতা হন। তাঁহার মাতা ও মাতামহী সুশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া তিনি শিক্ষালাভের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া-

ছিলেন। ভবানীপুরের হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। এই বিদ্যালয়ের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন কলিকাতার তদানীন্তন বিশপ রবার্ট মিলম্যানের কন্যা ভগিনী কুমারী ফ্রান্সিস কুমারী মেরিয়া। মৃড়ানীর রূপে গুণে চরিত্রে ও বুদ্ধিমত্তায় সিষ্টার মেরিয়া এত মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁহাকে বিলাত লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্কুলের খ্রীষ্টান মিশনারী শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীগণ সুযোগ পাইলেই হিন্দু ধর্মের নিন্দা এবং হিন্দু নরনারীগণকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিতেন। মৃড়ানী ইহার তীব্র প্রতিবাদপূর্বক অন্যান্য ছাত্রীদের লইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

ঠাকুরদেবতাদের প্রতি মৃড়ানীর আজন্ম ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। বালিকা কোন কারণে কাঁদিলে ঠাকুরদেবতার নাম শুনাইলেই শান্ত হইতেন। মূল্যবান্ অলঙ্কার ও যন্ত্রাদি ব্যবহারের দিকে তাঁহার মন ছিল না। খেলাধূলাতে তাঁহার মন কখনও আকৃষ্ট হয় নাই। এক শারদীয় প্রভাতে ভবানীপুরের এক বৃহৎ প্রাঙ্গণে মৃড়ানী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পার্শ্বে কয়েকটি বালকবালিকা ক্রীড়াসক্ত। এমন সময় একটি পথিক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এক্লাটি চুপচাপ বসে আছ কেন মা'? পথিকটি ব্রাহ্মণ। তাঁহার আজানুলম্বিত বাহু, গলায় যজ্ঞোপবীত, চক্ষে উদার দৃষ্টি এবং মুখে মৃদু হাস্য। মৃড়ানী উত্তর দিলেন, 'ও সব খেলা আমার ভাল লাগে না'। তখন হঠাৎ ব্রাহ্মণকে তাঁহার কত আপনার মনে হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'কৃষ্ণে ভক্তি হউক'। কিছুদিন পরে উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত বালিকার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী একটি বাগানে। এই বাগানের কুটীরে আসিয়া ব্রাহ্মণ মাঝে মাঝে সাধনা করিতেন। পূর্বপরিচিতা বালিকাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তুই এসেছিস্'! পার্শ্ববর্তী এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বালিকার খাওয়াথাকার বন্দোবস্ত হইল। পরদিবস প্রত্যূষে বালিকা গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে সাধক তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। গুরুর সন্নিধানে বালিকা দীক্ষামন্ত্র জপিতে জপিতে তন্ময় হইয়া গেলেন। সেদিন রাস পূর্ণিমা। বাড়ী ফিরিবার সময় শিষ্যাকে গুরু বলিলেন, 'যাও মা এখন। আবার গঙ্গাতীরে দেখা হ'বে'। এই গুরু অন্য কেহ নহেন, ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

ইহার কিছুদিন পরে মৃড়ানীর ভবানীপুরস্থ ভবনে এক সাধিকা ব্রজরমণী

মৃড়ানীকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে এক দামোদর শিলা সমর্পণপূর্বক সজল নয়নে বলিলেন, 'ইনি বড় জাগ্রত ঠাকুর। তোমার প্রেমে ইনি মজিয়াছেন। ইনি তোমার কাছে থাকিতে চান, তোমার পূজা ও সেবা লইতে ইচ্ছুক। তাই তোমার হাতে তাঁকে দিয়া আমি নিঃস্ব হইয়া বিদায় লইতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক'। ব্রজরমণী সেই দিনই চিরবিদায় লইলেন। এই শিলা মৃড়ানীর চিরসংগী। সেই দিন হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মৃড়ানী ইঁহার সেবাপূজা করিয়াছেন এবং সংগে সংগে রাখিয়াছেন। মৃড়ানীর দামোদর-প্রীতি এবং তীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া মাতা, পিতা ও অগ্রজ তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট কথায় জানাইয়া দিলেন, 'তেমন বরকে বিয়ে করবো যে কখনও মরে না'। মৃড়ানীর রুদ্রানী মূর্তি দর্শনে মাতা কন্যাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, 'মা তোর যদি বৈরাগ্যের ফুল সত্যিই ফুটে থাকে আমি বাধা দেব না'। মাতার সহযোগিতায় মৃড়ানী নির্দিষ্ট বিবাহ দিবসে গৃহত্যাগ করিলেন। দুই তিন বার তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি সকলের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইলেন।

শেষ বার আত্মীয়গণের সহিত গংগাসাগরে যাইয়া তিনি এমন নিরুদ্দেশ হইলেন যে, কেহ আর তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না। গংগাসাগর হইতে সন্ন্যাসিনী নাগ্নীমাতার সহিত তিনি হরিদ্বার গমন করেন। বাল্যকালে তাঁহার দূর সম্পর্কীয় চণ্ডীমামার নিকট হিমালয়ের মহিমা শুনিয়া মৃড়ানীর নগাধিরাজের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল। তিনি হরিদ্বার হইতে দুর্গম তীর্থ কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণে যান। দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে দ্বারকাধাম প্রভৃতি তীর্থও তিনি দর্শন করিলেন। কয়-জন ভারতনারী সন্ন্যাসিনীবেশে গৌরী মার মত তীর্থভ্রমণ করিয়াছেন ? হিমালয়, বৃন্দাবন, পুরী ও নবদ্বীপ গৌরী মার অতি প্রিয় তীর্থ ছিল। এই সকল স্থানে তিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। এইভাবে প্রায় আট দশ বৎসর তিনি তীর্থ-ভ্রমণ ও তপস্যায় অতিবাহিত করেন। এই সময় কত দিবা অনশনে, কত রাত্রি অনিদ্রায় তিনি কাটাইয়াছেন। তাঁহার গাত্রে অপরূপ সৌন্দর্য ও ব্রহ্মচর্যের বিমল জ্যোতিঃ জ্বল্ জ্বল্ করিত। স্বীয় শ্রী লুকাইবার জন্য তিনি মাথার চুল কাটিয়া ফেলিতেন। সর্বদা তাঁহার গলায় দামোদর শিলা ঝুলিতেন। পরিধানে সন্ন্যাসিনীর গেরুয়া বস্ত্র এবং সংগে চন্ডী, গীতা প্রভৃতি দুই তিন খানি ধর্মগ্রন্থ। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'দামোদর তাহার পতি'।

পুরীধামে এক বৃদ্ধ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গৌরী মাকে বলিয়াছিলেন, 'মাগো, দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলুম এক অসাধারণ মানুষ। তাঁর অপরূপ রূপ, ঘন ঘন সমাধি। তিনি জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢল ঢল'। পুরী হইতে গৌরী মা কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে উঠিলেন। বলরাম বাবু শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং গৌরী মার অগ্রজের পরম বন্ধু। গৌরী মা বলরাম বাবুকে দাদা এবং তাঁহার পিতাকে বাবা সম্বোধন করিতেন। বলরাম বাবু গৌরী মাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রায়ই বলিতেন। এক দিন রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় গৌরী মা এক মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখিলেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে ডাকিলেন। গৌরী মা তাঁহার আহ্বান শুনিলেন এবং অনুভব করিলেন, তিনি যেন সূতা বাঁধিয়া টানিতেছেন। পরদিন প্রত্যূষে বলরাম বাবু, তাঁহার পত্নী, চুনীলাল বসুর পত্নী প্রভৃতির সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। গাড়ী যখন কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইল তখন সোনার কিরণে চতুর্দিক আলোকিত। মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর স্বচ্ছ সলিল তরঙ্গায়িত এবং কুলু কুলু নাদে প্রবাহিত। গঙ্গাতটস্থ তরুশাখে বিহঙ্গকুল মধুর কূজনে মহামিলনের সঙ্গীত গাহিতেছে। পঞ্চবটীর চতুষ্পার্শ্বে দিব্য ভাবের পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে প্রবেশপূর্বক তাঁহারা দেখিলেন, তিনি একখানি চৌকীর উপর বসিয়া একটী কাঠিতে কতকগুলি সূতা জড়াইতে জড়াইতে গাহিতেছেন—

যশোদা নাচাত গো মা ব'লে নীলমণি,
সে রূপ লুকালি কোথা করালবদনি॥
একবার নাচ মা শ্যামা।

তাঁহারা কক্ষে প্রবেশ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণের সূতা জড়ান শেষ হইল। তিনি কাঠিটী এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। পূর্ব দিবস এবং অদ্য প্রাতে এই সূতার টান যেন গৌরী মা অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে তাঁহার চিত্ত অপার অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। প্রণামান্তে তিনি বুঝিলেন, ইনি পূর্বপরিচিত এবং পূর্ব-দৃষ্ট দীক্ষাগুরু। গুরুকে এতদিন পরে পাইয়া গৌরী মা আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার সেদিন বাগবাজারে ফিরিতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়া বলরাম বাবুর সহিত তাঁহাকে ফিরিতে হইল।

পরদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে গৌরী মা দুইখানি পরিধেয় বস্ত্র ও দামোদরকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ীর সদর দরজার সন্নিকটেই

দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি গৌরী মাকে দেখিয়া সানন্দে বলিলেন, 'তোর কথাই ভাবছিলুম'। গৌরী মার ইচ্ছা কালীবাড়ীতে থাকিয়া গুরুসেবা ও তপস্যা করেন। তখন তথায় নানা ধর্মসম্প্রদায়ের উন্নত সাধকগণ আসিয়া তপস্যারত থাকিতেন। গৌরী মা গুরুকে বলিলেন, 'আমি আমার নিত্যারাধ্যা ইষ্টদেব দামোদরের সিংহাসনে তোমার চরণযুগল দর্শন করিয়াছি'। তখন কালীবাড়ীর নহবতে থাকিয়া সারদামণি দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার নিকট গৌরী মাকে শ্রীরামকৃষ্ণ লইয়া যাইয়া বলিলেন, 'ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে। এই নাও, তোমার একটী সঙ্গিনী এলো'। গৌরী মাকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়া সারদামণির সকল প্রকার সুবিধা হইল। গৌরী মাও গুরুদেব এবং গুরুপত্নীর সেবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন। সারদামণি কালীবাড়ীতে না থাকিলে গৌরী মা কলিকাতায় থাকিতেন।

বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থানকালে একদিন গুরুদর্শনের নিমিত্ত অধৌত হস্তমুখে তিনি কালীবাড়ীতে ছুটিলেন। গুরুকে প্রণাম করিবার সময় তাঁহার মনে পড়িল, এঁটো হাতমুখ এখনো ধোয়া হয় নাই! লজ্জিতা হইয়া তিনি হাতমুখ ধুইতে গঙ্গায় গেলেন। এই সময়ের কথা শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় এই-ভাবে লিখিয়াছেন—"গৌরী দিদিমণি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্যা। মেয়েদের ভিতরে ঠাকুর ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। ঠাকুর যাহা ভোজনাদিতে খুবই প্রীতিপ্রসন্ন হইতেন ঐ সমস্ত উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী ইনি নিজ হস্তে তৈয়ারী করিয়া পরম যত্নে কত সময় সেবাদি করাইতেন। ইনি অতি সুকণ্ঠে নহবতে ঠাকুরকে অতিশয় ভাব ও মহাভাব সংযুক্ত কত গান ও কীর্তনাদিতে সমাধিস্থ করিয়া দিতেন। ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়া কতই আনন্দিত হইতাম। ঠাকুর আরও বলিতেন যে, গৌরী মহা তপস্বিনী এবং মহা ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী'।

গৌরীমা শ্রীগুরুর সহিত পানিহাটীর উৎসবে একবার গিয়াছিলেন নৌকায়। তাঁহার গর্ভধারিণী গিরিবালা ঠাকুরকে কয়েকবার দর্শন করিয়াছিলেন। গিরিবালার কনিষ্ঠা ভগ্নী ব্রজবালা এবং আরও দুই একজন নিকট আত্মীয়ও ঠাকুরকে দেখিয়া-ছিলেন। গিরিবালার স্বরচিত সংগীত তাঁহারই সুমধুর কণ্ঠে শুনিতে ঠাকুর ভাল-বাসিতেন। কিন্তু গিরিবালা অপরিচিত লোকের সম্মুখে গাইতে পারিতেন না। তখন ঠাকুর অন্যান্য লোকদিগকে তাঁহার ঘরের বাহিরে যাইতে নির্দেশ দিয়া গিরি-

বালাকে বলিতেন, 'তোমার সেই গানটি আর একবার গাও, মা'। গিরিবালা সেই সময় স্বরচিত শ্যামা-সংগীত গাহিয়া ঠাকুরকে শোনাইতেন। গৌরী মাও স্বমাতার ন্যায় সুগায়িকা ও সুকণ্ঠা ছিলেন। তিনি জননীকে সারদামণির নিকট লইয়া যান। সারদাদেবী তখন নহবতখানায় গৃহকর্মে ব্যাপৃতা ছিলেন। তাঁহারা আসিতেই তিনি সহাস্যবদনে তাঁহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। গিরিবালা সারদাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়াই বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, 'এ্যাঁ; মা তুমি! তুমি! এ যে আমার সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট দেবী'! এই বলিয়া তিনি সারদাদেবীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার পদধূলি কপালে ও মাথায় মাখিতে লাগিলেন। ইহাতে সারদা দেবী খুব হাসিলেন এবং গৌরী মাও অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবী ভবানীপুরে গিরিবালার ভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরখানি গিরিবালার অবর্তমানেও দীর্ঘকাল পূজাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও বলরাম বসু প্রভৃতি রামকৃষ্ণশিষ্যগণ একাধিক বার উক্ত ভবনে গিয়াছেন এবং আহারাদি করিয়াছেন। গৌরী মা ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এবং উভয়ের জননী-দ্বয়ের মধ্যেও অশেষ শ্রদ্ধা ও পরম প্রীতির ভাব ছিল। গৌরীমার জননীকে স্বামী বিবেকানন্দ 'দিদিমা' বলিয়া ডাকিতেন। উভয়ে নানাবিধ আলোচনা ও পরিহাস করিতেন। ধর্মবিষয়ক তর্ক উঠিলে গিরিবালা বলিতেন, 'ভারী ত আমার সাধু! খিড়কী দোর দিয়ে পালিয়েছে! তোমাদের আবার বাহাদুরী কি? আমাদের মত সংসারের জ্বালা সয়ে যদি ভগবান্‌কে ডাক্‌তে পারতে বুঝতুম হাঁ, মরদ'। স্বামিজীও পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিতেন, 'দিদিমা, সংসারের মোহ এখনও কাটাতে পাচ্ছ না, তোমাদের কি উপায় হবে'?

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এক সাহেব বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম উইলিয়াম। ঠাকুরের কাছে উইলিয়াম আসিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলরাম বসুর বাড়ীতে যাইয়া গৌরী মাকে দর্শন করিতে বলেন। তদনুযায়ী উইলিয়াম উক্ত ভবনে গৌরীমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাধিকাকে দেখিয়া সাহেব ভাবাবিষ্ট হইয়া 'মাদার মেরী', 'মাদার মেরী' বলিতে বলিতে তাঁহাকে প্রণামপূর্বক প্রার্থনা করেন, 'ভগবানে আমার ভক্তি হউক'। গৌরী মা সাহেবকে গুরুর আশীর্বাদ জানাইয়া প্রসাদ খাইতে দেন। উইলিয়াম পরমানন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। গৌরী মার কাছে

ঠাকুর-স্ত্রীভক্তদিগকে যাইতে বলিতেন এবং গৌরী মাকে স্ত্রীভক্তদের নিকটেও পাঠাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ কালীবাড়ীতে আসিয়া কেহ তাঁহার ঘরে, কেহ মন্দিরে, কেহ পঞ্চবটীতলায়, কেহ বা বেলতলায় বসিয়া জপধ্যান করিতেন। গুরুর নির্দেশানুসারে গৌরী মা সাধারণতঃ গুরুভ্রাতাগণকে মধ্যে মধ্যে আহার্য দিয়া আসিতেন। ঠাকুরের বালক-শিষ্যগণ অনেকে অল্পবয়স্ক ছিলেন। নরেন, রাখাল প্রভৃতি তখন খুব ছোট। একদিন রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শ্রীগুরুকে বলিলেন, 'আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে'। ঠাকুর শিষ্যদের সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি এই কথা শুনিয়া গঙ্গার ধারে যাইয়া, 'ও গৌরদাসী আয় না? আমার রাখালের যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাওয়া যাইত না। খানিক পরে গঙ্গাঘাটে একখানা নৌকা লাগিল এবং তন্মধ্য হইতে গৌরী মা প্রভৃতি ভক্তগণ এক গামলা রসগোল্লা লইয়া নামিলেন। ঠাকুর পরমানন্দে সেই মিষ্টান্ন রাখালপ্রমুখ বালকশিষ্যদের খাইতে দিলেন।

গৌরী মার কঠোর নিয়মনিষ্ঠা ছিল। কিন্তু গুরুভক্তির প্রভাবে তাহাও ক্রমশঃ নরম হইয়া যায়। এক রামনবমীর উপবাস দিবসে ঠাকুর জলযোগকালে একটা মিষ্টির অর্ধেক খাইয়া বাকীটা গৌরী মাকে খাইতে দিলেন। শিষ্যাও দ্বিরুক্তি না করিয়া গুরুর প্রসাদ খাইলেন। গুরু তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এই রে! আজ যে রামনবমীর উপোস'! গৌরী মা সরলভাবে উত্তর দিলেন, 'তোমার কাছে কি বিধি-নিষেধ চলে'? নিয়মনিষ্ঠার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে ইহা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীসারদামণি বলিতেন, 'গৌরদাসীর মত কঠোর তপস্যা একালে কারুর শরীরে সইবে না'। বৃদ্ধ বয়সেও গৌরী মা প্রত্যহ লক্ষ ইষ্ট নাম জপ করিতেন। দিবসের কর্মকোলাহলে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইলে গভীর নিশীথে তাহা সম্পূর্ণ হইত। কলিকাতার এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবের সহিত ধর্মালোচনাকালে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তিনি। এই উভয়ে অভেদ'। সংকীর্ণমনা বৈষ্ণব বিরক্ত হইয়া কানে আঙ্গুল দিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে হীন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তখন গৌরী মা গুরুনিন্দা শ্রবণে ব্যথিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং 'যেই রাম সেই কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ' বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করিলেন। গুরুপত্নীর প্রতি অধিকতর অনুরাগ দর্শনে গুরু একদিন শিষ্যাকে কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কাকে বেশী ভালবাসিস্ গো'! গৌরী মা এই গানটি গাহিয়া গুরুর প্রশ্নোত্তর দিলেন—

'রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী।
লোকের বিপদ হ'লে।
ডাকে মধুসূদন বলে॥
তোমার বিপদ হ'লে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী॥'

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন গৌরী মার হাতে গেরুয়া বস্ত্র দেন। গুরুর আদেশে সন্ন্যাসের বিরজাহোমাদি অন্যান্য অনুষ্ঠান শিষ্যা স্বয়ং কালী-বাড়ীতে করিয়াছিলেন। গুরু নিজে বিরজাহোমে একটি সাজ্য বেলপাতাও দিয়া-ছিলেন। এই সময় গুরু শিষ্যাকে সন্ন্যাসদানান্তে 'গৌরী আনন্দ' নাম দেন। গৌরী মা তাহাতে শ্রীগুরুকে বলেন, 'আমি গৌরের দাসীর দাসী, তাতেই আমার আনন্দ'! তিনি নিজেকে গৌরদাসী বলিতে গর্বানুভব করিতেন। গুরু শিষ্যাকে গৌরী বলিয়াই ডাকিতেন, কদাচিৎ গৌরদাসীও বলিতেন। গুরুপত্নী তাঁহাকে গৌরদাসী বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ কেহ তাঁহাকে গৌর মা, কেহ বা গৌরী মা সম্বোধন করিতেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে যোগিনী মা এবং দামুর বউ ('দামোদরের বধূ) বলিতেন। শ্রীগুরু শিষ্যার আরাধ্যদেব দামোদরকে বুকে মাথায় রাখিয়া আদর করিতেন; আর বলিতেন, 'এ সিদ্ধ শালগ্রাম'। সারদামণি দামোদরকে 'জামাই-ছেলে' বলিতেন এবং প্রত্যেক বৎসর জামাই-ষষ্ঠীতে তাঁহাকে কাপড় ও ফল-মিষ্টি দিতেন।

স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন, "ঠাকুর বলিতেন, 'গৌরী কৃপাসিন্ধ গোপী, ব্রজের গোপী...'। ঠাকুরের শিষ্যাদের মধ্যে গৌরী মাই সন্ন্যাসিনী এবং প্রধানা"। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং শিষ্যা গৌরী মার মধ্যে সেবাধর্মের ভাব জাগ্রত করেন। গুরু শিষ্যাকে বলরাম বসু ও যদু মল্লিকের বাড়ী এবং অন্যান্য স্থানে পাঠাইতেন নারীদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য। একদিন পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে ঊষার আলোকে ফুলবাগানে দাঁড়াইয়া গুরু শিষ্যাকে বলিলেন, 'দ্যাখ্ গৌরী, আমি জল ঢাল্‌ছি, তুই কাদা চট্‌কা'। নহবতখানার সন্নিকটে বকুলমূলে পুষ্পচয়নরতা শিষ্যা বিস্মিত নয়নে গুরুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'এখানে কাদা কোথায় যে, চট্‌কাবো। এখানে সবই যে কাঁকর'! গুরু হাসিয়া বলিলেন, 'আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝ্‌লি? এদেশের মেয়েদের বড় দুঃখু। তোকে তাদের মধ্যে কাজ ক'রতে হ'বে'। শিষ্যা গুরুবাক্যের বিশদার্থ গভীরভাবে চিন্তা করিলেন এবং পরে গুরুকে স্বীয়

অক্ষমতা জানাইয়া বলিলেন, 'সংসারী লোকের সাথে কাজ করা আমার পোষাবে না। হৈ হৈ করা আমার সয় না। আমার সাথে কতকগুলি মেয়ে দাও; আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্ছি'। গুরু হাত নাড়িয়া বলিলেন, 'নাগো না। এই টাউনে বসে কাজ করতে হ'বে। তোমার সাধনভজন ঢের হ'য়েছে! এখন তপস্যাময় জীবন মেয়েদের সেবায় লাগাও। ওদের বড় কষ্ট'।

গুরু যখন দেহত্যাগ করেন তখন শিষ্যা বৃন্দাবনে তপস্যামগ্না। দেহরক্ষার কয়েকদিন পূর্বে গুরু শিষ্যাকে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশপূর্বক বলিলেন, 'এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখ্‌তে পেলে না। আমার ভেতরটা যেন বিল্লিতে আঁচড়াচ্ছে'। কিন্তু গৌরী মার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর সারদামণি যখন বিধবার চিহ্ন ধারণ করিতে যাইতেছিলেন তখন ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'আমি কি মরেছি যে, তুমি বিধবার বেশ ধরবে ? গৌরীকে জিজ্ঞেস করো। সে ওসব শাস্ত্র জানে'। পতির দেহাবসানে সারদামণি বৃন্দাবনে যাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে গৌরী মাকে রাওলের এক নির্জন গুহার মধ্যে পাইলেন। ঠাকুরের উক্তি উল্লেখ করাতে গৌরী মা গুরুপত্নীকে বলিলেন, 'ঠাকুর চিন্ময়রূপে নিত্য বর্তমান, আর তুমি সাক্ষাৎ সরস্বতী, স্বয়ং লক্ষ্মী। তুমি সধবার বেশ পরিত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হ'বে'।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া গৌরী মা তপস্যা ও তীর্থ-পর্যটন করেন। ভারতের নারীজাতির দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। তিনি গুরুনির্দিষ্ট পথে কার্য করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প করিলেন। গুরুপত্নীর আশীর্বাদে ১৩০১ সালে বারাকপুরে গঙ্গাতীরে সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও পরিচালনার বিস্তৃত বিবরণ গৌরী মার জীবনীতে আছে। আশ্রমের ইতিহাস তাঁহার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। কাজের সুবিধার জন্য কয়েক বৎসর পরে ১৩১৮ সালে আশ্রম কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। বারাকপুর আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ পদার্পণ করিয়াছিলেন। আশ্রমের ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে গৌরী মার সহিত তাঁহার অনেক আলোচনা হয়। সারদাদেবী আশ্রমকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি বহুবার আশ্রমে পদার্পণপূর্বক আশীর্বাদ করিয়াছেন, 'আশ্রমের ভবিষ্যৎ জয়যুক্ত হউক'। তাঁহার অমোঘ আশীর্বাদ সম্যক্‌রূপে সত্য হইয়াছে। আশ্রমবাসিনীগণের মুখে স্তোত্র ও সঙ্গীতাদি শুনিয়া তিনি পরম প্রীতি লাভ করিতেন। আশ্রম যখন কলিকাতায় গোয়াবাগানে ছিল তখন তিনি তাঁহার একটী

প্রতিকৃতি আশ্রমে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি আশ্রমে সেই প্রতিকৃতির নিয়মিত পূজার্চনা হইতেছে। তিনি অনেককে বলিয়াছেন, 'গৌরদাসীর আশ্রমের সল্‌তেটী পর্যন্ত যে উস্‌কে দেবে তার কেনা বৈকুণ্ঠ'।

সারদাদেবী গৌরী মাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। দুঃখে কষ্টে রোগে শোকে সারদাদেবী গৌরী মার পাশে দাঁড়াইতেন। গৌরী মা একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তখন আশুতোষ চৌধুরীর মাতা স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া গৌরী মার সেবা-শুশ্রূষায় ব্রতী হন। সারদাদেবী এইজন্য আশুতোষ চৌধুরীর জননীকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন 'তুমি আমার মেয়ের যা সেবা করলে মা, এ জন্মেই মুক্ত হ'য়ে যাবে'। তিনি গৌরী মার বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা করিয়া বলিতেন, 'যে বড় হয় সে একটীই হয়। তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না, যেমন গৌরদাসী'। দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণ কালে মেয়েরা তাঁহাকে সভায় বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়া-ছিলেন, আমি লেক্‌চার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত'। গৌরী মা অনেক সভায় তাঁহার গুরুর জীবনী ও বাণী এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, বৃদ্ধ বয়সেও ভাগবত, চণ্ডী, গীতাদি শাস্ত্র হইতে শ্লোক অনর্গল নির্ভুল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতে তিনি নিয়মিতভাবে চণ্ডীপাঠ করিতেন। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় শারদীয় দেবীপক্ষে কয়েকদিন ধরিয়া বিধিমত চণ্ডীপাঠ ও হোম করা তাঁহার জীবনব্রত ছিল। চণ্ডীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'কলিকালে চণ্ডীপাঠ মহাযজ্ঞ'।

গৌরী মার আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু শিষ্য ও শিষ্যা—গোলাপ মা, যোগেন মা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি গিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের শুভেচ্ছা এবং সারদাদেবীর শুভাশীষে আশ্রমের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইল। প্রায় ত্রিশ বৎসর ভাড়া-বাড়ীতে থাকিবার পর আশ্রমের স্থায়ী ভূমি ও ভবন লাভ হয়। ১৩৩১ সালের পৌষ মাসে বর্তমান ভবনে আশ্রমটী স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের বর্তমান জমি সারদাদেবীর ইচ্ছানুসারে ক্রয় করা হয়। সেই জমিতে তিনি পদার্পণ করিয়াছিলেন। কি কষ্টে যে গৌরী মা আশ্রমের ব্যয়-নির্বাহ করিতেন, আশ্রমের জমি ক্রয় ও নব ভবন নির্মাণ করিলেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আশ্রমটীকে স্থায়ী করিবার জন্য তিনি বুকের রক্ত বিন্দু

বিন্দু পাত করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বঙ্গসমাজে গৌরী মা নারী হইয়া একাকিনী যাহা করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। ভারতের নারী-শিক্ষার ইতিহাসে তাঁহার নাম ও দান চিরস্মরণীয়। তিনি নিজে বাড়ী বাড়ী যাইয়া অর্থভিক্ষা, মুষ্টিভিক্ষা করিতেন, নিজ হাতে বাজার করিতেন এবং নিজ হাতে রান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন। এমন অনেক দিন গিয়াছে, তিনি সামান্য একখানি কাপড় পরিয়া আশ্রম-গৃহ ঝাঁট দিয়াছেন, উঠান ও বারান্দা পরিষ্কার করিয়াছেন। অপরিচিত কোন ব্যক্তি আসিলে তিনি পরিচয় দিতেন, 'আমি আশ্রমের ঝি'।

আশ্রমটীকে বালিকাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বলা যাইতে পারে। বালকদের জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম আমাদের দেশে আছে। কিন্তু কন্যাদের জন্য এইরূপ আশ্রম ছিল না বলিলেই হয়। সুতরাং গৌরী মার আশ্রমটী অসামান্য, অভিনব এবং যুগোপযোগী। গৌরী মা সত্যই বলিতেন, 'নারীর সুশিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না, নারীই জাতির জননী'। বিদ্যালয় বিভাগে বালিকাগণ আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আদর্শে দীক্ষিতা হয়; ইহাই বর্তমান যুগের প্রয়োজন। আশ্রমে অনেকগুলি বালিকা থাকে। তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী নানাভাবে চরিত্র-গঠনের সহায়ক। বালিকাগণ সকালে ও সন্ধ্যায় দেবদেবীর স্তোত্রাদি পাঠ ও প্রার্থনা করে। তাহাদিগকে গীতা ও উপনিষদাদি শাস্ত্র পড়ান হয়। বৈশাখ মাসে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে শিবপূজা শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা চিরকুমারী থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য আশ্রমের মঠ-বিভাগ আছে। দুর্গা পুরী, সুতপা পুরী, সুমিত্রা পুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসিনীগণ গৌরী মার হাতে শিক্ষিতা। দুর্গা পুরীকে সারদাদেবীই সন্ন্যাস দিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মে পুরুষের ন্যায় নারীরও সন্ন্যাসে সমান অধিকার আছে।

অসংখ্য হিন্দু নারী গৌরী মার পূত প্রভাবে ধর্মজীবন লাভ করিয়াছেন। বালিকাগণকে তিনি 'জ্যান্ত জগদম্বা' বলিতেন। জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবায় তাঁহার প্রাণ নিঃশেষিত হইল। ১৩৪২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি একটী সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বাণী প্রচার করেন। ইহা নিখিল ভারত বেতার সঙ্ঘ কর্তৃক বেতারযোগে চতুর্দিকে প্রেরিত হয়। ১৩৪৪ সালে তিনি অন্তিম অসুখে শয্যাশায়িনী হন। তখন এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, চারিদিকে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে করিতে মহাদেব ও পার্বতী আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার সাধনায়

আমরা সন্তুষ্ট। এবার পূর্ণাহুতি দাও'। তিনি স্বপ্নে যজ্ঞ করিয়া পূর্ণাহুতি দিলেন। গৌরী মার জীবন-যজ্ঞ সমাপ্ত হইল ১৩৪৪ সালে ফাল্গুন মাসে (১৯৩৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী)। তিনি যখন দেহরক্ষা করেন তখন তাঁহার বয়স আশী বৎসরের অধিক হইয়াছিল। কাশীপুরের শ্মশানে তাঁহার স্থূল দেহ ভস্মীভূত হয়। তথায় তাঁহার একটী ক্ষুদ্র স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই শ্মশানেই তাঁহার গুরু-দেবের ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়।

চতুর্দশ মণি

ভগ্নী নিবেদিতা

উত্তর কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে নিবেদিতা লেনে নিবেদিতা স্কুল বিদ্যমান। উক্ত উচ্চ ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয় ভগ্নী নিবেদিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রায় চৌদ্দ বৎসর বাগবাজার পল্লীতে নিবেদিতা বাস করিয়াছিলেন বলিয়া এই গলির নাম 'নিবেদিতা লেন' রাখা হইয়াছে। ভগ্নী নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ব্রহ্মচারিণী শিষ্যা। শ্রীগুরুর আহ্বানে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতের নারীজাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে আসেন। তিনি ভারতকে স্বদেশতুল্য শ্রদ্ধা করিতেন এবং স্বীয় স্বাক্ষরকালে লিখিতেন, 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। তাঁহার নিবেদিতা নামটী অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছে। তিনি ইংরাজিতে স্বামী বিবেকানন্দের যে স্মৃতি-কথা লিখিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি অনবদ্য ও অনতিক্রান্ত। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারান্তে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খৃীঃ লণ্ডনে যাইয়া বক্তৃতাদি দেন। তখন তিনি স্বামিজীর সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতবাসীর প্রতি আকৃষ্টা হন।

১৮৬৭ খৃীঃ ২৮শে অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে নিবেদিতার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। তাঁহার পিতার নাম সামুয়েল রিচমণ্ড নোবল এবং মাতার কুমারী জীবনের নাম ইসাবেল হামিলটন। ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডেভনের গ্রেট টরিংটন গ্রামে তাঁহার মাতাপিতা বাস করিতেন। মাতাপিতা কন্যাকে আদর করিয়া 'ম্যাজি' বলিয়া ডাকিতেন। সামুয়েল ছিলেন খৃীষ্টান পাদ্রী। পিতা স্কচ ও মাতা আইরিশ। নিবেদিতা নামটী গুরুদত্ত। কিন্তু যখন তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন তখনই তাঁহার মাতা তাঁহাকে চিরতরে পরমেশ্বরের পাদপদ্মে নিবেদন করেন। এই আশ্চর্য ঘটনাটী স্বামিজীর মার্কিণ শিষ্যা কুমারী ম্যাকলিয়ডকে লণ্ডনের এক রেস্টোরাঁতে চা-পানের সময় নিবেদিতার মাতা বলিয়াছিলেন। ইসাবেল হামিলটন পরমা সুন্দরী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। মার্গারেট ছিলেন তাঁহার প্রথম সন্তান। অল্প বয়সে তিনি গর্ভবতী হন। যতই সন্তানপ্রসবের দিন সমীপবর্তী হইল ততই তিনি প্রসববেদনার ভয়ে ভীতা হইলেন। অথচ নারী-

সুলভ লজ্জাবশতঃ পতির বা অন্য নারীর নিকট নিজ ভীত ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। প্রসবের দিন যতই নিকটে আসিতে লাগিল ততই তাঁহার ভয় বাড়িল। নিরুপায় হইয়া সমস্ত অন্তর দিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'হে প্রভু! যদি নিরাপদে আমার প্রথম সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হয়, আমি তাহাকে তোমার চরণে সমর্পণ করিব'। নিরন্তর আন্তরিক প্রার্থনার সুফল সুনিশ্চিত। মার্গারেট নিরাপদে জন্মগ্রহণ করিলেন। কুমারী ম্যাকলিয়ড বলেন, 'মার্গারেট যে মাতৃগর্ভেই ঈশ্বরপদে নিবেদিতা ইহা স্বামিজীও জানিতেন না, মার্গারেটও জানিতেন না। জননীর শুভেচ্ছা কন্যার জীবনে পূর্ণ হইল। গুরু যখন শিষ্যার নিকট ভারতের সেবায় আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তাব করিলেন তখন মার্গারেটের পিতা স্বর্গগত। মাতার নিকট মার্গারেট ভারতাগমনের অনুমতি চাহিলেন। নোব্‌ল পত্নীর তখন মনে পড়িল যে, তাঁহার প্রাণপ্রতিম কন্যা জন্মের পূর্ব হইতেই ভগবৎচরণে নিবেদিতা। তিনি সর্বান্তঃকরণে কন্যাকে ধর্মকার্য্যের জন্য ভারতে আসিতে অনুমতি দিলেন। *

বাল্য হইতে মার্গারেটের বুদ্ধি প্রখর এবং বিদ্যানুরাগ প্রবল ছিল। তিনি লণ্ডনে শিক্ষালাভ সমাপনান্তে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম করেন। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিশুশিক্ষাদানে তিনি নিপুণা ছিলেন। শিক্ষার সংস্কারক ও ব্যবস্থাপকরূপেও তাঁহার বেশ সুনাম ছিল লণ্ডনে। উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপের তিন চারটী প্রধান ভাষা সযত্নে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃঃ লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তিনি পরিচিতা হন এবং স্বামিজীর ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্বেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া সম্বোধন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে পুনরায় লণ্ডনে আগমন করেন এবং ই. টি. স্টার্ডির বাড়ীতে থাকিয়া জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তখন মার্গারেট স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। ১৮৯৮ খৃঃ নভেম্বর মাসে তিনি ভারতে আগমনপূর্বক বাগবাজার পল্লীর বসুপাড়া গলিতে অবস্থান করেন। তৎপূর্বেই তাঁহার গুরুদেব ভারতে আসিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই মার্গারেট গুরু কর্তৃক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিতা এবং 'নিবেদিতা' নাম প্রদত্ত হন। গুরু শিষ্যাকে নিম্নোক্ত ইংরাজি কবিতায় আশীর্বাণী দিয়াছিলেনঃ—

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪৭ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী প্রেমঘনানন্দের প্রবন্ধে ঘটনাটী বিবৃত।

The mother's heart, the hero's will,
The softest flowers' sweetest feel,
The charm and force that ever sway
The alter flowers flaming play;
The strength that leads in love obeys,
Far reaching dreams and patient ways!
Eternal faith in self, in all,
The light divine in great, in small;
All these and more than I could see,
Today may Mother grant to thee.

অনুবাদ।—মাতৃহৃদয়, বীরের ইচ্ছাশক্তি, কোমল কুসুমের মধুরতম স্পর্শ, সমুজ্জ্বল সুন্দর বেদীপুষ্পের মাধুর্য, ও বীর্য, যে বিজয়শক্তি প্রীতিবলে বলবতী হইয়া মন্থর বেগে সুদূর স্বপ্নবৎ সংকল্প সিদ্ধ করে তাহা, পরমাত্মাতে ও সকল প্রাণীতে অটল অসীম বিশ্বাস, ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বভূতে দিব্যালোক দর্শন—এই সকল এবং অন্যান্য অনেক যাহা সকলের কাম্য তৎসমুদায় আজ জগদম্বার কৃপায় তোমার লাভ হউক।

গুরুর আদেশে নিবেদিতা বাগবাজারস্থ বসুপাড়া গলিতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮৯৮ খৃীষ্টাব্দের শেষার্ধে। প্রায় এক বৎসর বিদ্যালয়টী চালাইয়া ১৮৯৯ খৃীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই গুরুর সঙ্গে তিনি কলিকাতা হইতে জাহাজে উঠিয়া ৩১শে জুলাই লণ্ডনে উপস্থিত হন। নিবেদিতা বলেন, 'শ্রীগুরুর সঙ্গে পৃথিবী পর্যটন আমার নিকট তীর্থভ্রমণতুল্য হইয়াছে'। ইংলণ্ডে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা * প্রদত্ত হয় লণ্ডনের সিসেম ক্লাবে ১৯০০ খৃীঃ ২২শে অক্টোবর 'ভারতীয় জীবনের নূতন ব্যাখ্যা' সম্বন্ধে। স্বামিজী কয়েক সপ্তাহ পরে লণ্ডন হইতে আমেরিকা যাত্রা করেন এবং নিবেদিতা গুরুর সহিত তথায় সেপ্টেম্বরের শেষে মিলিত হন। আমেরিকায় এক বন্ধুর গৃহে প্রায় দেড় মাস গুরু ও শিষ্যা অতিথি ছিলেন। ১৯০০ খৃীঃ ব্রিটানীতে উভয়ে এক বন্ধুগৃহে একপক্ষ বিশ্রাম করেন। ১৯০০ খৃীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামিজী আমেরিকা হইতে ইউরোপ হইয়া ভারতে

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯০২ জুন সংখ্যায় মূল বক্তৃতাটী প্রকাশিত।

প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু নিবেদিতা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাংশ পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্যে থাকিয়া যান। তিনি শিকাগো সহরে 'হল হাউস'এর প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী জেন আদামসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। হল হাউসের মত একটী প্রতিষ্ঠান তিনি কলিকাতায় স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। শিকাগোতে এক শিক্ষিত ভদ্রলোক নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'যখন প্লেগ মহামারী ভারতে হয় তখন কি করে বলা যায় যে, ভারত পরম চরম সত্যের অধিকারী'? জিজ্ঞাসুর ধারণা, আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইলে মানুষ রোগ দুঃখ কষ্টাদি হইতেও মুক্ত হয়।

ভারতে আসিবার কয়েক মাস পরে কলিকাতার আলবার্ট হলে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সোমবার 'কালী ও তাঁহার পূজা' সম্বন্ধে নিবেদিতা একটী সুচিন্তিত ভাষণ দেন। তখন কলিকাতায় এত সামাজিক সংকীর্ণতা ছিল যে, নিবেদিতার বক্তৃতার জন্য সভাপতি পাওয়া গেল না! বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ এন. এন. ঘোষ মহাশয় পৌরোহিত্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে সম্মতি দিলেন, কিন্তু কার্যকালে অস্বীকার করিলেন। নিরুৎসাহ না হইয়া নিবেদিতা বিনা সভাপতিত্বেই বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার সারাংশ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৮৯৯) এবং পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি 'কালীমাতা' শীর্ষক যে পুস্তিকা ইংরাজিতে লিখিয়াছিলেন, তাহা ১৯০০ খ্রীঃ লন্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। গুরুর জীবিত কালেই পুস্তিকাটী রচিত ও মুদ্রিত। গুরুর 'কালীমাতা' কবিতা ইহাতে উদ্ধৃত এবং এই কবিতার নামানুসারেই পুস্তিকার নাম। লেখিকা পাশ্চাত্ত্য শিশুর জন্য মা কালীর যে গল্প ইহাতে লিখিয়াছেন তাহা অপূর্ব। দুঃখের বিষয়, বইখানি এখনও বাংলায় অনূদিত হয় নাই।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে নিবেদিতা পাশ্চাত্ত্য হইতে ফিরিয়াই পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কাজে হাত দিলেন। স্বীয় চরিত্রের মাধুর্যে ও ঔদার্যে তিনি কলিকাতার আপামর সাধারণের সম্মাননীয়া ও শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠেন। তিনি স্বেচ্ছায় হিন্দু ললনাগণের ন্যায় জীবনযাপনে এবং ছাত্রীগণকে শিক্ষাদানে ব্রতী হইলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের নিকট হইতে কোন বেতনাদি লওয়া হইত না। এই বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন শ্রীমতী ওলি বুল নাম্নী ধনী মার্কিন মহিলা। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা এবং প্রধানতঃ ইঁহার অর্থানুকূল্যে বেলুড় মঠ স্থাপিত

হয়। স্বামিজীর আর এক মার্কিন শিষ্যা অশেষগুণালঙ্কৃতা ভগ্নী ক্রীষ্টিন* নিবেদিতার সহিত যোগদান করেন। নিবেদিতা বলেন, 'ক্রীষ্টিনের একনিষ্ঠতা ও কর্মপটুতার গুণে বিদ্যালয়টী স্থায়ী ও সমৃদ্ধ হয়'। আড়ম্বরমাত্রহীনা, সামান্য বস্ত্রভূষিতা রুদ্রাক্ষধারিণী নিবেদিতা যখন বাগবাজার পল্লীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন তখন তাঁহাকে স্বর্গচ্যুতা দেবীমূর্তি মনে হইত। শীতপ্রধান দেশে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালিতা হইয়াও তিনি গ্রীষ্মপ্রধান কলিকাতা নগরীতে এক ক্ষুদ্র গৃহে কি কষ্টে থাকিতেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। নিবেদিতার ঘরে গ্রীষ্মনিবারণের জন্য একখানি টানাপাখাও ছিল না! একখানা হাতপাখাই সর্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। এই ছোট ঘরটীর ভিতর দিনের অধিকাংশ সময় তিনি কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। বেশীর ভাগই লেখাপড়ার কাজ। কার্যকালে তাঁহার মন এত একাগ্র হইত যে, তাঁহার গ্রীষ্মবোধ থাকিত না! কাজ শেষ করিয়া তিনি যখন ঘরের বাহিরে আসিতেন তখন অসহ্য গরমে তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিত। দারুণ গ্রীষ্মে তাঁহার দেহ ঘর্মাক্ত হইত এবং তাঁহার মাথা ধরিত। এক এক দিন কপালে হাত দিয়া মাথায় চাপ দিতেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবেদিতার এই তপস্যাকে সতীর তপস্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যের জন্যই নিবেদিতা বই লিখিতে আরম্ভ করেন। 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড', 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'মডার্ণ রিভিউ' এবং 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। এইরূপ বহু সারগর্ভ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। 'The Master as I saw Him,' 'Footfalls of Indian History', 'The Web of Indian Life', 'Aggressive Hinduism','Religion and Dharma' প্রভৃতি তাঁহার পুস্তকাবলী গভীর চিন্তাশীলতায় সমুজ্জ্বল। "The Master as I saw Him" পুস্তকে স্বীয় গুরুদেবের বাণীর যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন তাহা অপূর্ব। নিবেদিতার গ্রন্থাবলী স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর মৌলিক ভাষ্যরূপে পঠিত হইতে পারে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি. কে. চাইন জগৎপ্রসিদ্ধ দর্শনপত্রিকা 'হিবার্ট জার্ণ্যালে' উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "এই পুস্তকখানি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হইতে

* মৎপ্রণীত 'দেশবিদেশের মহামানব' (১ম ভাগ) পুস্তকে ক্রীষ্টিনের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

পারে। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের নিম্নে, কিন্তু 'সেণ্ট অগাষ্টাইনের স্বীকৃতি', সাবেটিয়ার প্রণীত 'সেণ্ট ফ্রান্সিসের জীবনী' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের সহিত একই সেল্‌ফে এই পুস্তকের স্থান"।

গুরু শিষ্যাকে ভারতীয় ভাবে ভাবিত করিবার জন্য কখনো কখনো খুব নির্মম ও কঠোর হইতেন। আজন্ম পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বর্ধিত মহিলার পক্ষে পুরোপুরি হিন্দুভাবাপন্ন হওয়া কত কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষণীয় বিষয় বিশাল, কিন্তু সময় অত্যল্প। শিষ্যাও বুদ্ধিমতী, চিন্তাশীলা এবং উচ্চ-শিক্ষিতা ছিলেন। তাই তিনিও গুরুবাক্য বিচারপূর্বক গ্রহণ করিতেন। নিবেদিতা-প্রমুখ কয়েকটী পাশ্চাত্ত্য শিষ্যা সমভিব্যাহারে গুরু আলমোড়ায় একবার ছিলেন। তখন গুরু ও শিষ্যার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে তুমুল তর্ক হইত। একদিন গুরু শিষ্যাকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। দলের একজন নিবেদিতার পক্ষে স্বামিজীকে বলিলেন, 'এইরূপ তিরস্কারের কুফল সুদূরপ্রসারী হইতে পারে'। গুরু নীরবে সব শুনিয়া স্বকক্ষে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যাসমাগমে তিনি শিষ্যাগণের গৃহে যাইয়া নিবেদিতার পক্ষপাতিনী শিষ্যাকে শিশুসুলভ সরলতায় বলিলেন, 'তুমি ঠিক বলিয়াছিলে। আমারও পরিবর্তন আবশ্যক। আমি একাকী জঙ্গলে যাইতেছি। আমি যখন ফিরিব তখন শান্তি আনিব'। তখন দ্বিতীয়ার চাঁদ আকাশে উদিত, গভীর অন্ধকারের মধ্যে যেন ক্ষীণ আলোক উঁকি মারিতেছে। স্বামিজী নিবেদিতার দিকে ফিরিয়া উল্লসিত অন্তঃকরণে কোমল স্বরে বলিলেন, দেখ, মুসলমানেরা নূতন চাঁদের সম্বন্ধে পবিত্র ভাব পোষণ করে। এস, নূতন চাঁদের সহিত আমরাও নূতন জীবন আরম্ভ করি'। ইহা বলিয়া তিনি শিষ্যার মস্তকে হাত দিয়া প্রাণভরা আশীর্বাদ করিলেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহিনী শিষ্যা গুরুপদে নতজানু ও যুক্তকর। গুরুর আশীর্বাদে শিষ্যের মনে পরম প্রশান্তি আসিল, শিষ্যার জ্ঞান-চক্ষু তৎক্ষণাৎ উন্মীলিত হইল। নিবেদিতা বলেন, 'সেই মধুর মুহূর্তে আমার হৃদয়ের জ্বালা চিরতরে জুড়াইয়া গেল। আমার নব জন্ম হইল, আমার ভুল ভাঙিগল। আমি বুঝিলাম, শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণ শিষ্যের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি দানের জন্য'। ভগ্নী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে নিবেদিতা স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্যার যদুনাথ সরকারের সহিত বুদ্ধগয়া গিয়াছিলেন। তথায়

তাঁহারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় বোধিবৃক্ষের তলে বসিয়া ধ্যান করিতেন। বোধিবৃক্ষের অনতিদূরে এক বৃহৎ বৃত্তাকার প্রস্তর খণ্ডের উপর একটি বজ্রচিহ্ন ছিল। প্রবাদ আছে, এই বজ্র ইন্দ্রদেব বুদ্ধদেবকে দিয়াছিলেন। নিবেদিতার অনেক গ্রন্থে এই বজ্র-প্রতীক দৃষ্ট হয়। প্রস্তরোপরি বজ্র-চিহ্ন দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, 'ইহাই ভারতের জাতীয় প্রতীক হওয়া উচিত। উক্ত প্রতীকের ভাবার্থ এই যে, মানুষ যখন জগতের কল্যাণার্থ সর্বস্ব ত্যাগ করে তখন সে বজ্রবৎ শক্তিশালী হয়'।

ভগ্নী নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পের মহাসমর্থক ছিলেন। ভারতীয় শিল্পীর যে কোন মৌলিক চিত্রের তিনি প্রশংসা করিতেন। ১৯০৮ খৃীঃ হইতে ১৯১১ খৃীঃ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি 'মডার্ণ রিভিউ' নামক ইংরাজি মাসিকে শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও মন্তব্য লিখিতেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতমাতা' চিত্রটী যখন 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিকে প্রকাশিত হইল তখন তাহা দেখিয়া নিবেদিতার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তরুণ শিল্পিগণের চিত্রাবলীর দোষগুণ বিচার করিতেন। আচার্য বসুর সহিত তিনি একদিন কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। শিল্পী নন্দলাল বসু তখন সেই স্কুলের ছাত্র। নন্দলাল তখন দুইখানি ছবি অঙ্কন করিয়াছিলেন—একখানা মা কালীর, অন্যখানা সত্যভামার। নিবেদিতা মনোযোগের সহিত ছবি দুটী দেখিলেন, এবং প্রশংসা করিলেন এবং শিল্পীকে উৎসাহ দিলেন। কালীর ছবি দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'আরও একটু ঢলঢলে ভাব হবে, সাজসজ্জা বেশী থাকবে না এবং আরও বেশী উন্মাদিনী রূপ হওয়া চাই'। নিবেদিতা অসামান্য শিল্প-সমালোচিকা ছিলেন, ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। স্যার যদুনাথ সরকার* বলেন, 'ভারতীয় শিল্পের বঙ্গীয় বিভাগ নিবেদিতার বিচক্ষণ পরিচালনা ও পরামর্শের নিকট চিরঋণী'।

অজন্তার চিত্রাবলী দর্শনে নিবেদিতা আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। তথায় রাহুল ও যশোধরার চিত্রে মুখের ও চক্ষুর ভাব খুব জীবন্ত। তাঁহার মতে অজন্তার চিত্রাবলীতে উৎকৃষ্ট ভারতীয় চারু শিল্পের ভাব প্রকটিত। তিনি বলিতেন, 'এলিফ্যাণ্টার ত্রিমূর্তিতে হিন্দু ধর্মের সমন্বয়-ভাবটী প্রস্তরীভূত'। তিনি ভারতীয়

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৩৫ জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার 'নিবেদিতা স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

জাতীয়তার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন গ্রেপ্তার হইয়া কলিকাতার পুলিশ আদালতে বিচারার্থ আনীত হন তখন কেহ সাহস করিয়া তাঁহাকে জামিনে খালাস করিবার জন্য অগ্রসর হন নাই। বিদেশিনী নিবেদিতা আদালতে যাইয়া যখন জামিন হইতে চাহিলেন তখন সকলেই বিস্মিত হইলেন। ডন সোসাইটির কার্যেও তাঁহার সহযোগ ও সহানুভূতি ছিল। এই সোসাইটির সভ্যগণ এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে 'গীতা' লইয়া স্বদেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করিতেন। স্বদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান ব্রতী ছিল নিবেদিতা সেইগুলির পরম হিতৈষিণী ছিলেন। ভারত-মাতার নিন্দা তিনি শুনিতে পারিতেন না। লণ্ডনের এক সভায় ভারত সরকারের এক ইংরাজ অফিসারের স্ত্রী মন্তব্য করেন, 'ভারতের ভদ্র পরিবারের অন্তঃপুরে অনৈতিকতা প্রভাবশালী'। নিবেদিতা এই মিথ্যা মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলে নিন্দাকারিণী মহিলা ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, তিনি ইহা এক মিশনারীর নিকট শুনিয়াছিলেন। নিবেদিতা সভার মধ্যেই তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত একটি এত সুসভ্য জাতির চরিত্রে দোষারোপ করা ধৃষ্টতামাত্র'।

শ্রীগুরুর কৃপায় নিবেদিতা ভারতমাতার মৃন্ময়ী মূর্তির পশ্চাতে চিন্ময়ী মূর্তির দর্শন পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের কাছে ভারতবর্ষের কথা বলিতে বলিতে তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ছাত্রীদের তিনি বলিতেন, "ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা! ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে সপ্রেমে জপ করিবে, ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা!' এই বলিয়া নিজের জপমালা হাতে লইয়া নিবেদিতা জপ করিতে লাগিলেন, 'মা! মা! মা'! ভারতবর্ষকে তিনি যে কত ভালবাসিতেন তাহা এই ঘটনা হইতে উপলব্ধ হয়। নিবেদিতার কাছে যে গোয়ালা দুধ দিত সে একদিন তাঁহার নিকট ধর্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত সংকুচিতা হইলেন এবং আপনাকে অপরাধিনী মনে করিয়া গোয়ালাকে বার বার নমস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি ভারতবাসী। তুমি আমার নিকট কি ধর্মোপদেশ চাও? ধর্মসম্বন্ধে তোমরা কি না জান? তুমি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। তোমাকে আমি নমস্কার করি"। নিবেদিতা নিজেকে ভারতবাসী বলিতে গর্ব অনুভব করিতেন। শ্রীগুরুর

ন্যায় শিষ্যার হৃদয় ভারতপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল।

নিবেদিতার শিক্ষাপ্রণালী ছিল আদর্শ শিক্ষয়িত্রীর ন্যায়। কথা বলার সময় তিনি কতকগুলি কথার উপর অধিক জোর দিতেন। ছাত্রীদের লেখায় অথবা অঙ্কে ভুল থাকিলে তখনই তাহা ভাল করিয়া কাটিয়া দিতেন, এবং সর্বদা বলিতেন, 'ভুল কখনও রাখিবে না। ভুল বুঝিবামাত্র কাটিয়া দিবে'। কোন বালিকা ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। কারণ, ইহাতে মাতৃভাষার দৈন্য সূচিত হয়। একদিন কোন ছাত্রী শ্লেটে দাগ টানিতে টানিতে বলিয়াছিল, লাইন টানিতেছি। লাইন শব্দটি শুনিবামাত্র নিবেদিতা বালিকাটির কাছে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, 'নিজের ভাষায় বল'। কিন্তু লাইনের বাংলা প্রতিশব্দটি ছাত্রী তখন ভাবিয়া পাইল না। ছাত্রীগণ বলিতে লাগিল, 'সিষ্টার, আমরা ত বরাবর লাইন বলি'। দুঃখে, বিরক্তিতে নিবেদিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'তোমরা তোমাদের মাতৃভাষাও ভুলিয়া গেলে'। তাহার পর একটি বালিকা বলিল, 'লাইনের বাংলা প্রতি-শব্দ রেখা'। একটি হারানো জিনিষ কুড়াইয়া পাইলে লোকের যেমন আনন্দ হয় তেমনি নিবেদিতার অপার আনন্দ হইল। তিনি 'রেখা' শব্দটি বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বাংলা ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে এবং কাজের চাপে, তিনি উত্তমরূপে বাংলা শিখিতে পারেন নাই। তথাপি এক-একটি ছোট ছোট কথা যখন যাহার নিকট শিখিবার সুবিধা পাইতেন তখন তাহাই শিখিয়া লইতেন। সে সময় যদি একটি বালিকাও তাঁহার শিক্ষয়িত্রী হইত তাহার নিকটেও তিনি বিনীতা ছাত্রীর ন্যায় আচরণ করিতেন।

ভারতের তীর্থস্থানগুলি নিবেদিতা সুযোগমত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর সহিত তিনি কাশ্মীরের অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী তীর্থদ্বয় দর্শন করেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার ইংরাজী পুস্তকে পাওয়া যায়। তিনি হিমালয়ের কেদারনাথ ও বদরীনাথ তীর্থদ্বয়ও দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার তীর্থভ্রমণের কাহিনী তিনি ছাত্রীদের নিকট গল্প করিয়া বলিতেন। বদরীনাথের পথে অলকানন্দা নদীতীরে তিনি এক হিন্দু বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলেন। বৃদ্ধা নদীতে স্নান করিয়া ভিজা কাপড় পরিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধা হইয়াছেন, তাঁহার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি শীতকে গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে, তিনি অলকানন্দা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া যুক্ত করে সূর্যের দিকে তাকাইয়া সূর্যদেবকে প্রণাম

করিতেছিলেন। নিবেদিতা বৃদ্ধার ধর্মনিষ্ঠার কথা বলিতে বলিতে নিজেই হাতজোড় করিয়া বলিলেন, 'বৃদ্ধার কি সুন্দর মুখ! তাহার ধর্মভাবোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দিকে আমি চাহিয়া রহিলাম'। বদরীনাথের পথে আর একস্থানে এক বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তুষার-পিচ্ছিল পথে প্রাচীনা অগ্রে চলিতেছিলেন, নিবেদিতা তাঁহার পশ্চাতে। সেই বৃদ্ধার কথা নিবেদিতা এইভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুষার গলিয়া গিয়াছে। পিচ্ছিল পথে তাঁহার পা সরিয়া যাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন? আমি আপনার বাহু ধরিতে পারি কি'? আমার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধা মৃদু হাস্য করিলেন। আহা! কি সুন্দর তাঁহার হাসি! কিন্তু বৃদ্ধা আমার সাহায্য না লইয়া নিজে লাঠির উপর ভর দিয়া চলিয়া গেলেন"।

একদিন রাজপুতানার ইতিহাস বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিবেদিতা তাঁহার চিতোরভ্রমণের কাহিনী ছাত্রীগণকে এইভাবে বলিতে লাগিলেন—'আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাথরের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম, মুদ্রিত নয়নে পদ্মিনী দেবীর কথা স্মরণ করিলাম'। ইহা বলিতে বলিতে সত্যই নিবেদিতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার মুখের অপূর্ব ভাবশ্রী যিনি দেখিয়াছেন তিনি আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না। নিবেদিতা আরও বলিলেন, 'অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী করযোড়ে দণ্ডায়মানা। আমি চোখ বুজিয়া পদ্মিনী দেবীর শেষ চিন্তাটি মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম। আহা! তাহা কি সুন্দর! তাহা কি নির্ভীক'!! ইহা বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মুদ্রিত নয়নে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।

কোন ছাত্রীর হাতে আঁকা আলপনা তিনি স্বীয় শয়নকক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই আলপনার মধ্যে একটি শতদল পদ্ম এবং উহার চারি পাশে ছোট ছোট জুঁই ফুল অঙ্কিত ছিল। এই আলপনা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, চিত্রকলাবিৎ কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহাকে এই আলপনাটি দেখাইতেন। একদিন মহানন্দে ছাত্রীদিগের নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন, 'সিংহলের ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী আজ এই আলপনার খুব প্রশংসা করিলেন'। সহস্রদল শ্বেতপদ্মের চিত্র তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন 'এই পদ্ম ভারতীয় চিত্রকর ব্যতীত অন্য দেশীয় চিত্রকর আঁকিতে পারে না'। ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামীর সহযোগে তিনি হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আখ্যায়িকা সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

প্লেগ-মহামারীর প্রকোপে যখন সমগ্র কলিকাতার অধিবাসিগণ সন্ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত তখন এই দেবীতুল্যা পরদুঃখকাতরা সহৃদয়া সাধিকা মুমূর্ষু রোগিগণের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ত্যাগ ও সেবার আদর্শে জীবন উৎসর্গ করিলে মানুষ পরদুঃখে কত কাতর হয়, পরসেবায় কত তৎপর হয় তাহার উদাহরণ নিবেদিতার জীবন। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ কি তাহা নিবেদিতা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন সারদামণি দেবী, গোলাপসুন্দরী দেবী, অঘোরমণি দেবী প্রমুখ সাধিকাগণের পূত স্পর্শে আসিয়া। তিনি বলেন, 'হিন্দু নারীগণের এই ধৈর্য, নীরবতা, সরলতা, ত্যাগ ও পবিত্রতার ফলে ভারতীয় সমাজ এত উন্নত, ভারতীয় সভ্যতা এত সমৃদ্ধ'। কোন আন্তর্জাতিক নারীসম্মিলনে নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, "আঠার শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপ একটিমাত্র মেরী সৃষ্টি করিয়াছে। আদর্শ নারী পাশ্চাত্ত্যে অনেক হইয়াছেন, কিন্তু আদর্শ জননী খুব কম। কিন্তু হিন্দুস্থানের গৃহে গৃহে আদর্শ নারী ও আদর্শ জননী দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য নারী যে শ্রদ্ধার সহিত গির্জায় গমন করেন ভারতীয় নারী সেই শ্রদ্ধার সহিত পতির নিকটে যান। নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি মাতৃত্বে"। নিবেদিতার মতে যে আগ্রহভরা প্রেম কখনও ত্যাগ করে না, যে আশিস সদা আমাদিগকে বর্মবৎ রক্ষা করে, যে উপস্থিতি হইতে আমরা দূরে যাইতে পারি না, যে হৃদয়ের সমীপে আমরা সদা নিরাপদ ও নির্ভয়, অতল মাধুর্য, অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন, নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা—এই সকল এবং আরও অনেক কিছু আছে মাতৃত্বে।

অধিক পরিশ্রমে অল্প বয়সে নিবেদিতার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। স্বাস্থ্য লাভের জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অতিথিরূপে ১৯১১ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে তিনি দার্জিলিং গমন করেন। সেখানে যাইয়াই তিনি দুরারোগ্য আমাশয়-রোগে আক্রান্ত হন। ডাঃ নীলরতন সরকার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। তিনি প্রায় তিন সপ্তাহ ভুগিয়া ১৯১১ খ্রীঃ ১৩ই অক্টোবর (১৩১৮ সালের ২৬শে আশ্বিন) শুক্রবার প্রাতে প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তাঁহার মুখনিঃসৃত শেষ-বাক্য "The boat is sinking but I shall see the sun rise' অর্থাৎ 'আমার জীবন-তরী জলমগ্ন হইতেছে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই সূর্যোদয় দেখিব'। তাঁহার শেষ ইচ্ছানুসারে তাঁহার শবদেহ শ্মশানে হিন্দুপ্রথায় ভস্মীভূত করা হয়।

শবদেহের শোভাযাত্রায় আচার্য জগদীশ বসু, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গজননীর কৃতীসন্তানগণ যোগদান করিয়াছিলেন। রায় ভিলা হইতে বেলা দুইটার সময় শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চারটায় স্থানীয় হিন্দু শ্মশানে উপস্থিত হয়। শবদেহের এত বড় শোভাযাত্রা দার্জিলিং-এ কখনো হয় নাই। শবযাত্রিগণের হরিধ্বনিতে ক্ষুদ্র সহরটি মুখরিত ও শোকমগ্ন হইল। প্রায় পাঁচটার সময় চিতার আগুন জ্বলিল। অচিরে নিবেদিতার স্থূল দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইল।*

'মারহাট্টা', 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'এম্পায়ার', 'স্টেটসম্যান' প্রভৃতি পত্রিকায় এই শোকসংবাদ প্রকাশিত হইল। তাঁহার শ্মশানোপরি একটি স্মৃতিফলক নির্মিত হইয়াছে। দার্জিলিং রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত একটি স্কুলের নাম নিবেদিতা বিদ্যালয় রাখা হইয়াছে। কুমিল্লাতেও একটি নিবেদিতা বিদ্যালয় ছিল। নিবেদিতার দেহাবশেষের কিয়দংশ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ মন্দিরে এবং কিয়দংশ ইংলন্ডের উত্তর ডেভন সিমেটারীতে প্রোথিত হয়। ভগ্নী নিবেদিতার দেহ-রক্ষার সংবাদ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (১৩১৮ কার্তিক সংখ্যায়) এইভাবে প্রকাশিত হয়। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগগনে আর একটি জ্যোতিষ্কের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণমালারঅমৃত বর্ষণ হইতে ভারত এবং সমগ্র পৃথিবী আজ বঞ্চিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা শ্রীশ্রীউমামহেশ্বরের পরমপদে নিবেদিত কুমারী নিবেদিতা শ্রীগুরু সকাশে বহুজন-হিতায় যে ব্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অক্ষুণ্ণভাবে পূর্ণ করিয়া নিজ শরীর মন অদ্য আহুতি-স্বরূপে প্রদানপূর্বক অভয়ধামে গমন করিয়াছেন।...নিজ প্রতীক উপহার দানকালে শ্রীগুরু একদিন শিষ্যাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি ভারতের ভাবী বংশধরগণের শিক্ষয়িত্রী হও'। ভগ্নী নিবেদিতাও চতুর্দশ বর্ষ গুরুবাক্য বর্ণে বর্ণে কায়মনোবাক্যে পূর্ণ করিয়া অদ্য ঈশ্বরকৃপায় জ্বলন্ত জীবন্ত মৃতসঞ্জীবক ভাবতনুতে পরিণত হইয়াছেন।......" যতদিন স্বামী বিবেকানন্দের নাম ধরাধামে থাকিবে ততদিন ভগ্নী নিবেদিতার নামও উচ্চারিত হইবে।

---

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯১১ নভেম্বর সংখ্যায় বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত।

পঞ্চদশ মণি

সারদামণি দেবী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী ছিলেন সারদামণি দেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের নামের সহিত সারদামণির নামও আজ জগদ্বিদিত। হিন্দু নারীর, হিন্দু সহধর্মিণীর আদর্শ সারদামণির জীবনে মূর্ত হইয়াছিল। বিবাহিতা হইয়াও তিনি ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। পতির সহিত তাঁহার দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না, আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পরিণীতা পত্নীকে বলিতেছেন, 'ন বা অরে মৈত্রেয়ী, পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি'। অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ী, পতির দেহের জন্য পতি প্রিয় হয় না, তন্মধ্যস্থ আত্মার জন্য পতি প্রিয় হয়। এই বেদবাক্য সারদামণির জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। পতির জীবিতকালে তিনি তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা ও ভক্তি করিতেন এবং পতির দেহাবসানে ঈশ্বরকে পতিরূপে দেখিতেন। সন্তানের জননী না হইয়াও তিনি মাতৃত্বপদে আরূঢ়া হইয়াছিলেন এবং সকলের পুত্রকন্যাকে স্বীয় সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করিতেন।

ভগ্নী নিবেদিতা বলেন, সারদামণির সরল শুদ্ধ জীবন প্রার্থনার নিবিড় নীরবতাতুল্য শান্তিময়, সাধনাময়। নিবেদিতা ১৯০১ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর রবিবার কেম্ব্রিজ (মাসাচুসেটস্, আমেরিকা) হইতে সারদামণিকে যে ইংরাজি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে অনূদিত হইল। "পরম পূজনীয়া মা! আজ সকালে গির্জায় গিয়াছিলাম সারা সি. বুলের জন্য প্রার্থনা করিতে। তথায় সকলে যীশুর মাতা মেরীর কথা ভাবিতেছিল। কিন্তু, হঠাৎ তোমার কথা আমার মনে পড়িল—তোমার প্রিয় বদন, তোমার স্নেহার্দ্র দৃষ্টি, তোমার সাদা সাড়ী এবং তোমার কণ্ঠহার। তোমার এই সবই মানসনেত্রে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমার মনে হইল, একমাত্র তোমার শুভাশিসই হতভাগ্য সারাকে রোগশয্যায় সান্ত্বনা ও শান্তিদানে সমর্থ। জান মা, আমার আর কি মনে হইয়াছিল? ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যারত্রিকের পর আমি যখন তোমার পাশে বসিয়া ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতাম তখন আমি কি বোকামি না করিয়াছি? হায়! কেন আমি তখন বুঝি নাই যে, তোমার স্নেহসিক্ত পাদমূলে ছোট শিশুর মত বসিয়া থাকাই আমার পক্ষে যথেষ্ট! পরমারাধ্যা মা আমার! তুমি অতিশয় স্নেহ-

ময়ী। আমাদের বা জগতের প্রীতির মত, তোমার স্নেহে উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নাই। তোমার মধুর স্নেহে আছে পরম প্রশান্তি, অসীম মাধুর্য যাহা সকলের কল্যাণ সাধনে রত, কিন্তু কখনো কাহারো অনিষ্ট চিন্তা করে না। ইহা রঙ্গীন সোনালী আভার মত। কয়েক মাস পূর্বে সেই রবিবারটি কি পুণ্যদিন ছিল যেদিন গঙ্গাস্নানের অব্যবহিত পূর্বে তোমার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিলাম এবং স্নানান্তেও পুনরায় তোমার চকিত দর্শন পাইয়াছিলাম! তোমার সাদর সম্ভাষণে ও সস্নেহ সমাদরে সেদিন কি স্বর্গীয় স্বাধীনতা ও শান্তির আস্বাদ না অনুভব করিয়াছি! প্রিয়তমা জননী আমার! তোমাকে যদি প্রাণ ভরিয়া একটি অদ্ভুত স্তব বা আন্তরিক প্রার্থনা করিতে পারিতাম! কিন্তু তাহাও যেন বিরল, যেন চীৎকার মনে হয়। তুমি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অলৌকিক সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব বিশ্বপ্রেমপূর্ণ পেয়ালা। এই সকল নিঃসহায় দিনে তাঁহার সন্তানগণের তুমি একমাত্র আশ্রয়। সামান্য কৌতুক বা ক্রীড়া ব্যতীত অন্য সময় তোমার কাছে আমাদের নীরব ও সুশান্ত থাকা উচিত। ঈশ্বরের অলৌকিক সৃষ্টিনিচয়ই শান্ত শিশিরপাতের মত দৃষ্টি অগোচরে জীবনে প্রবেশ করে। গঙ্গার ও উদ্যানের মাধুর্যবৎ, অরুণালোক ও মলয়তুল্য তুমি নীরব। হতভাগ্য সারাকে তোমার শান্তির আচ্ছাদন প্রেরণ কর। যখন তখন তোমার প্রশান্তিপূর্ণ চিন্তাই আমার প্রাণে মধুবর্ষণ করে। তোমার চিন্তায় যে প্রশান্তি পাই তাহাতে প্রীতি বা ঘৃণা নাই। পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত তাহাই কি ঈশ্বরদত্ত অপার্থিব আশিস নহে? পরম প্রীতিময়ী মা আমার! তোমার এই বোকা 'খুকী' চিরতরে তোমার চরণে নিবেদিতা"

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রামে ১৮৫৩ খৃীঃ ২২শে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী দিবসে এক দরিদ্র ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণকুলে সারদামণির জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যজনযাজন, কৃষিকর্ম এবং যজ্ঞসূত্র রচনাদির দ্বারা অতি কষ্টে জীবিকা অর্জন করিতেন। তাঁহার মাতা শ্যামসুন্দরী দেবী অতিশয় সরলা ও স্নেহময়ী ছিলেন। দারিদ্র্যসত্ত্বেও রামচন্দ্রের দয়া ও দান চলিত। ১৮৬৪ খৃীঃ বঙ্গদেশে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় তখন রামচন্দ্র নিরন্ন গ্রামবাসিগণকে দুই বেলা অন্নদান করিতেন। অন্নদান কার্যে কন্যা সারদাও পিতার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণের ছয়টি পুত্রকন্যার মধ্যে সারদা ছিলেন সর্বাগ্রজা। বাল্যকালে সারদা পিতার শস্যক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য খাবার লইয়া যাইতেন, বাড়ীর গরুগুলির জন্য ঘাস

কাটিতেন এবং ধানকাটার সময় মাঠে ধান কুড়াইতেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল গম্ভীর। সমবয়স্ক বালিকাগণ যে সকল খেলায় মাতিয়া যাইত সেইগুলিতে তাঁহার কোন আগ্রহ ছিল না। অসাধারণ সরলতা ও নির্মলতা এবং পরম স্নেহের জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। বাল্যে কালী ও লক্ষ্মী দেবীদ্বয়ের মৃন্ময়ী মূর্তি লইয়া তিনি খেলিতে ভালবাসিতেন। পরম ভক্তিভরে সেই দেবীমূর্তিসমূহ পত্র-পুষ্পে সাজাইয়া তিনি পূজা করিতেন। তাঁহার ধ্যানপ্রবণতা শৈশবেই লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহাদের বাড়ীতে প্রত্যেক বৎসর প্রতিমায় জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা হইত। প্রতি বৎসর পূজার সময় তিনি প্রতিমার সম্মুখে এমন গভীর ধ্যানে বসিতেন যে, দর্শকগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইত।

সারদা বাল্যে লেখাপড়ার কোন সুযোগ পিতৃগৃহে বা শ্বশুরালয়ে পান নাই। তাঁহার সেই চেষ্টা কখনো কখনো বাধাপ্রাপ্ত হইত। শ্বশুরালয়ে তিনি যে শিশুপাঠ্য পুস্তক পড়িতেন তাহা ভাগিনেয় হৃদয়রাম দেখিয়া কাড়িয়া নেন। তথাপি ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীর সাহায্যে তিনি অবসরসময়ে রামায়ণাদি গ্রন্থ পড়িতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কখনো লিখিতে দেখা যায় নাই। লেখাপড়ার অসুবিধা হইলেও তাঁহার ধর্মশিক্ষার প্রচুর সুযোগ ছিল। তাঁহাদের গ্রামে প্রায়ই যাত্রা বা কথকতা বা মেলাদি হইত। তিনি গৃহের বয়স্থা নারীগণের সহিত তথায় যাইতেন এবং ধর্মসঙ্গীত এবং পৌরাণিক কাহিনী মন দিয়া শুনিতেন। মাতা এবং পিতার নৈষ্ঠিক ধর্মজীবনও তাঁহার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সারল্য ও সৌন্দর্যের গুণে তিনি গৃহের এবং গ্রামের বয়স্থাদের স্নেহাস্পদ হইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে, ছয় সাত বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত। বিবাহের কথা তাঁহার বিশেষ মনে ছিল না। এই সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'যখন খেজুর পাকে তখন আমার বিবাহ হয়। বিবাহের দশ দিনের মধ্যে আমি যখন শ্বশুরালায় যাই তখন খেজুরগাছের তলায় পাকা খেজুর কুড়াইতাম'। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন তেইশ চব্বিশ বৎসর। জগন্মাতার প্রথম দর্শনলাভের পর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেবীর নিত্য নিরন্তর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্তপ্রায় তখন মাতা তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করেন। শত চেষ্টায় কোন কন্যার সম্বন্ধ পাওয়া যাইতেছিল না। তখন সাধক স্বয়ং বলিলেন, 'জয়রামবাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা আমার জন্য 'কুটাবাঁধা' হয়ে আছে'।

১৮৬৭ খৃীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুরে গমন করেন।

তখন সারদামণি পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়ে আসিয়া পতির সহিত মিলিত হন। যখন তাঁহার বিবাহ হয় তখন তিনি শিশুমাত্র, বিবাহের অর্থ তিনি তখন আদৌ বোঝেন নাই। এখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। সুতরাং ইহাই প্রকৃতপক্ষে পতির প্রথম দর্শনলাভ। এখন সারদামণি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় মনোযোগ দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি সারদামণিকে আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যে চেষ্টিত হইলেন। তৎপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু তোতাপুরীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিষ্য বিবাহিত শুনিয়া গুরু মন্তব্য করিয়াছিলেন, "বিবাহ হলে কি হয়েছে"? আত্মজ্ঞানের প্রকৃত পরীক্ষা এই যে, পত্নীর সহিত থাকিলেও মন ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য লালায়িত হইবে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হয়। মন তখন দেহমনাতীত অদ্বৈতভাবে মগ্ন হয়। পিত্রালয়ে সাত মাস থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। বিবাহিত পত্নীতে তাঁহার পত্নীবুদ্ধি আসিল না। তিনি সারদামণিকে শিষ্যাজ্ঞানে ধর্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন। সাংসারিক কর্ম হইতে ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত সকল বিষয়ের শিক্ষা সারদামণি দেবতুল্য পতির নিকট পাইয়া নবজীবন লাভ করিলেন, সহধর্মিণীর উৎকৃষ্ট আদর্শে দীক্ষিতা হইলেন। পতিকে গুরুজ্ঞানে সেবা করা, পতির ধর্মজীবনের সহায়ক হওয়াই তাঁহার জীবনব্রত হইল। মহাসাধক পতির বিশুদ্ধ প্রেমের স্পর্শে তাঁহার হৃদয় আনন্দময় হইয়া উঠিল। এই সময়ের কথা পরবর্তী কালে সাধিকা সারদামণি এই ভাবে বলিতেন, 'আমি বোধ করিতাম, যেন আমার হৃদয়ে আনন্দের ঘট স্থাপিত আছে। যে স্বর্গীয় আনন্দে হৃদয় তখন সদা পরিপূর্ণ থাকিত তাহা ভাষায় যথাযথ বর্ণনা করা যায় না'। সারদামণি পতির কৃপায় দিব্য সম্পদের অধিকারিণী হইলেন।

সাত মাস কামারপুকুরে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন এবং পুনরায় সাধন-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। তিনি জগন্মাতার চিন্তায় এত তন্ময় হইলেন যে, তাঁহার দেহজ্ঞান রহিল না, তিনি আহারনিদ্রাও ভুলিলেন। লোকে বলিতে লাগিল, তিনি পাগল হইয়াছেন। 'কথা কাণে হাটে।' এই মিথ্যা কথা অবিলম্বে কামারপুকুরে ও জয়রামবাটীতে রটিল। সারদামণি এই সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। পতিদর্শনের উৎকণ্ঠা তাঁহাকে উন্মনা করিল। তখন গঙ্গাস্নানের জন্য গ্রামের অনেকে কলিকাতা আসিতেছিলেন। সারদামণি পিতার নিকট গঙ্গাস্নানে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কন্যার মনোভাব বুঝিয়া পিতা কন্যার সহিত যাইতে প্রস্তুত

হইলেন। জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা ষাট মাইল পথ। এই দীর্ঘ পথ কন্যাকে পাল্কীতে লইয়া যাইবার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা পিতার ছিল না। কন্যাকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে যাইতে হইল। দীর্ঘ পথ চলার অভ্যাস সারদার ছিল না। পথিমধ্যে পথশ্রমে তিনি পরিশ্রান্ত ও জ্বরাক্রান্ত হইলেন। রোগশয্যায় সংজ্ঞাশূন্য ও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সারদা শায়িতা। তখন তাঁহার এক অলৌকিক দর্শন হইল। তিনি দেখিলেন, কালবর্ণা সুন্দরী বালিকা একটী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন এবং সপ্রেমে তাঁহার পিঠে ও মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'আমি তোমার ভগ্নী, দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে থাকি। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি'। উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিল। ইহার পরে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন ভোরে দেখা গেল, সারদার জ্বর নেই, দেহ সুস্থ! পিতাপুত্রী দক্ষিণেশ্বরের অভিমুখে আবার যাত্রা করিলেন। পথে পুনরায় জ্বর হইলেও কোনও রকমে রামচন্দ্র কন্যাকে লইয়া রাত্রিসমাগমে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন ১৮৭২ খৃীষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

সারদামণিকে অসুস্থ অবস্থায় সমাগত দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইলেন এবং স্বীয় কক্ষে তাঁহার জন্য একটী স্বতন্ত্র শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি শিশুর মত সরলভাবে সারদাকে বলিলেন, 'আহা! এখন তুমি এলে। এখন কি আর মথুর বাবু আছে? সে থাকিলে তোমার কোন অসুবিধা এখানে হইত না তার স্থান কে নেবে'? শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় সারদামণি তিন চারি দিনের মধ্যে সুস্থ হইলেন। তখন তিনি নহবতের নীচের তলায় শ্বাশুড়ী চন্দ্রামণি দেবীর কাছে দিনের বেলা থাকিতেন। পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় দেবতুল্য পতির সংগলাভে সারদা পরম আনন্দিত হইলেন। দিবাভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বহু সাধুভক্তের সমাগম হইত। সুতরাং সারাদিন তিনি পতির দর্শন পাইতেন না। রাত্রিতে যাইয়া তাঁহার সেবা করিতেন, ও এক শয্যায় শুইতেন। কিন্তু রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষে নিদ্রা আসিত না। তিনি কখনও ভাবসমাধিতে নিষ্পন্দ হইতেন, কখনো বা জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলিতেন। সুতরাং সারদার আদৌ ঘুম হইত না। পতির দিব্য ভাব দর্শনে পত্নীর পত্নীত্ব শিষ্যাত্বে পরিণত হইল। সারদার হৃদয়ে শিষ্যার ভাব, সাধিকার ভাব জাগিল। সারদামণির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কখনো পত্নীর প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ বা দুর্ব্যবহার করেন নাই। তিনি বলিতেন, 'তোমার মনে একটু আঘাত দিলে আমার ঈশ্বরভক্তিও উড়ে যাবে'। শ্রদ্ধা প্রদর্শন দ্বারাই নারীর মধ্যে

মাতৃত্ব, দেবীত্ব জাগ্রত হয়। একদিন সারদা পতির পদসেবাকালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে তোমার কি মনে হয়?' অবিলম্বিত উত্তর আসিল, 'যে কালীমাতা মন্দিরে বিরাজিতা তিনিই আমার পার্শ্বে উপবিষ্টা। তোমার মধ্যে সাক্ষাৎ জগদম্বাকে দেখিতে পাই।'

নারীতে দেবীবুদ্ধি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবুকতামাত্র ছিল না। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতির, সাধনলব্ধ সিদ্ধির প্রকাশমাত্র। পত্নীর প্রতি নারীবুদ্ধি চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে কিনা তাহা একদিন তিনি পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। নির্জন কক্ষে রাত্রিতে যখন সারদা নিদ্রিতা তখন তিনি স্বীয় মনকে বলিলেন, 'রে মন, এই নারী দেহ। তোমার কামনা থাকিলে এখন ইহা সম্ভোগ করিতে পার।' তখন তাঁহার মন-পাখী দেহভাব ভুলিয়া চিদাকাশে উঠিয়া গভীর সমাধিতে মগ্ন হইল। সমস্ত রাত্রি সমাহিত অবস্থায় কাটিল। এইরূপে পাঁচ মাস এক শয্যায় বিবাহিতা যুবতী পত্নীর সহিত শয়ন করা সত্ত্বেও তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র কামভাব আসিল না। পাছে পতির দিব্য ভাবের ব্যাঘাত হয় এইজন্য সারদা এখন হইতে নহবতে শয়ন করিতে লাগিলেন। বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার পত্নীর মনে কামভাব আদৌ না থাকে। তিনি উপরোক্ত পরীক্ষার পর বুঝিলেন, জগদম্বা তাঁহার আকুল প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তিনি বলিতেন, 'সারদার মন তুষারধবল, পবিত্র ও কামগন্ধহীন না হইলে আমার মন দেহভূমিতে নামিয়া আসিত কি না কে জানে? চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কালিমা আছে। কিন্তু সারদার মন নিষ্কাম, নিষ্কলঙ্ক'!

কালিকার পাষাণমূর্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের দেবীজ্ঞান যেমন দৃঢ় ছিল সারদার রক্তমাংসময় দেহেও তাঁহার সেই জ্ঞান তেমনি দৃঢ় ছিল। তিনি ১৮৭৩ খৃঃ ফল-হারিণী কালীপূজার রাত্রে সারদাকে কালীজ্ঞানে বিধিবৎ পূজাও করিয়াছিলেন। জগতের ধর্মেতিহাসে এই সাধনা অপূর্ব। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় সাধক ভক্তগণকে জানাইলেন যে, তিনি নিজের ঘরে পৃথকভাবে কালীপূজা করিবেন। স্থান মার্জিত ও বিধৌত, বেদী স্থাপিত ও ফুলচন্দনাদি সংগৃহীত হইল। অমানিশার ঘনান্ধকারে জগৎ সমাচ্ছন্ন। সাধক তখন স্বীয় পত্নীকে ডাকিলেন পূজার স্থানে। তিনি ভাবমগ্ন। ইঙ্গিতে সারদাকে বেদীর উপর বসাইয়া বিবিধ উপাচারে পূজা করিলেন। কালীমূর্তি যে ভাবে তিনি পূজা করিতেন ঠিক সেইভাবেই এই নারীমূর্তিকে পূজা

করিলেন। গভীর ধ্যানে পূজিতা নারীর মধ্যে জগজ্জননীর প্রকাশ অনুভবান্তে যখন তৎপদে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিলেন তখন পূজারী ও পূজিত উভয়ে সমাধিস্থ হইলেন! সমাধিতে পূজারী অনুভব করিলেন পূজিতার মধ্যে জগদম্বার প্রকাশ এবং পূজিতাও দেখিলেন পূজারীর মধ্যে ও স্বহৃদয়ে এক সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর। পতির সঙ্গে প্রায় এক বৎসর চারি মাস কাটাইয়া ১৮৭৩ খৃীঃ অক্টোবর মাসে তিনি পিত্রালয়ে ফিরিয়া যান এবং পূর্ববৎ গৃহকর্মে মনোযোগ দেন।

১৮৭৫ খৃীঃ এপ্রিল মাসে সারদা পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আসেন। সেইবার শ্রীরামকৃষ্ণ কঠিন আমাশয়-রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিরাময় হইলেও তিনি নিজে আমাশয়ে শয্যাশায়িনী হন। একটু সুস্থ হইয়া জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি স্বগ্রাম জয়রামবাটীতে যান। তথায় তিনি উক্ত রোগে এত কঙ্কালসার হন যে, জলে নিজ জীর্ণ দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তিনি ভীতা হইতেন। সারদার অসুখের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় ভাগিনেয়কে বলিয়াছিলেন, 'ওরে হৃদয়, এ কি জগতে এসেই শুধু শুধু চলে যাবে মানবজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করে?' কোন প্রতিবেশিনীর পরামর্শে সারদা স্বগ্রামের সিংহবাহিনী দেবীর মন্দিরে অনাহারে হত্যা দেন। তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িতেই স্বপ্নে দেখিলেন, সিংহবাহিনী দেবী আসিয়া একটী ঔষধ বলিয়া দিলেন। সেই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহার অসুখ শীঘ্র সারিয়া গেল। তখন হইতে সিংহবাহিনীর মন্দিরে লোকসমাগম বাড়িল এবং দেবী জয়রামবাটী ও তৎপার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের অধিবাসীদের পূজা পাইতে লাগিলেন। সারদার সাধনায় সিংহবাহিনী জাগ্রতা হইলেন।

১৮৭৭ খৃীঃ দক্ষিণেশ্বর যাইবার পথে একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় নারীর সরলতা ও বিশ্বাসে কিরূপে পাষাণ পাশবিক হৃদয় বিগলিত হয়। পথে একটী বিস্তৃত মাঠ অতিক্রম করিতে হয়। সঙ্গীগণ অগ্রসর হইয়া চলিলেন পাছে মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা হইয়া যায়। মাঠে চোর-ডাকাতের উপদ্রব থাকায় পথিকগণ এই মাঠ অতিক্রমকালে খুব ভয় পাইত। পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় সারদা সঙ্গীগণের পশ্চাতে রহিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দিক সমাবৃত হইল। সারদা একাকিনী পথিমধ্যে বিপদে পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, একটী কৃষ্ণকায় সুদীর্ঘ বিশালদেহ ব্যক্তি লম্বা লাঠি হাতে লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। উক্ত ব্যক্তি সারদাকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি?' সরলা সারদা সাহসে ভর করিয়া

বলিলেন, 'বাবা, আমি তোমার মেয়ে। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। তাঁকে দেখতে যাচ্ছি। সঙ্গীগণ আমাকে ফেলে চলে গেছে।' তৎপরেই তিনি দেখিলেন, লোকটীর পশ্চাতে এক রমণী আসিতেছে। সারদা তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনে দ্রবীভূত করিয়া সব কথা বলিলেন। ঐ পুরুষটী ডাকাত এবং ঐ রমণী তাঁহার স্ত্রী। ডাকাত সারদার সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কন্যাজ্ঞানে রাত্রিতে তাঁহাদের পর্ণ কুটীরে রাখিলেন এবং পরদিন তারকেশ্বর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন। এই একরাত্রির ব্যবহারে সারদা ডাকাত ও তাঁহার স্ত্রীকে এত আপনার করিয়া লইয়াছিলেন যে, বিদায়কালে উভয়ে কাঁদিতে লাগিল। পরে তাহারা তাহাদের 'কন্যা' ও 'জামাই'কে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিল। সারদার সংস্পর্শে যিনিই আসিতেন তিনিই তাঁহার স্নেহ ও সরলতায় অভিভূত হইতেন।

মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে বা পিত্রালয়ে গেলেও সারদামণি প্রায় তের বৎসর দক্ষিণেশ্বরে পতি-সান্নিধ্যে কাটাইয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃীঃ ভক্ত শম্ভু মল্লিক তাঁহার জন্য কালীমন্দিরের পার্শ্ববর্তী স্থানে একটী ছোট কুটীর নির্মাণ করাইয়া দেন। সেই কুটীরে তিনি প্রথমে থাকিতেন। কিন্তু পতিসেবার জন্য তাঁহাকে অধিকাংশ সময় নহবতে বাস করিতে হইত। নহবতের ১০।১২ বর্গফুট ঘরের মধ্যে কত কষ্টেই না তিনি এত বৎসর ছিলেন? তিনি ছিলেন স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা ও মিষ্টভাষিণী। সেইজন্য অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণীর ন্যায় নহবতে এত সংগোপনে থাকিতেন যে, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না। কালীবাড়ীর কর্মচারিগণ বলিতেন, 'তিনি এইখানে থাকেন শুনেছি, কিন্তু কখনো দেখি নাই।' তাঁহার নহবত-বাস সীতার বনবাসতুল্য। তিনি ভোর রাত্রে তিন চারটার সময় উঠিয়া শৌচাদি এবং গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে পূজা ও ধ্যানে বসিতেন। দীর্ঘ সময় এইভাবে কাটাইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যগণের সেবায় তিনি নিযুক্তা হইতেন। সেই ক্ষুদ্র কক্ষে রান্নার জিনিষ-পত্র এবং বাসনাদিও থাকিত। তথায় কখনো কখনো শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যাগণের কেহ কেহ রাত্রিযাপন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব দিনে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের রান্নাও ঐ ঘরে হইত! শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ হইতে নহবত ৪০।৫০ হাত দূরে অবস্থিত। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সারদামণির মাসের পর মাস দেখা হইত না। তাহা সত্বেও উভয়ের মধ্যে কি অসীম সম্প্রীতি! শ্রীরামকৃষ্ণ শুষ্ক নীরস সাধক ছিলেন না। তিনি ছিলেন রসরাজ আনন্দময় পুরুষ। তিনি সারদামণির সহিত নির্দোষ রসিকতাও

করিতেন। সারদামণির জীবনে সেবা এবং সাধনার স্রোত বহিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণির সাধনায় দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে পরিণত। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে সারদামণি সকালে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে পূজাধ্যানে বসিতেন। এই অভ্যাসটী তাঁহার বৃদ্ধ বয়সেও কার্যকরী ছিল। দেবতুল্য পতির কৃপায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় ঈশ্বরদর্শন করেন।

সারদামণি স্বয়ংসিদ্ধা সাধিকা হইলেও তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি সদা গোপন করিয়া রাখিতেন। ভাবসমাধি প্রভৃতির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইত। কিন্তু সারদামণির ঐশ্বর্যের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার সকল শক্তি গুপ্ত ছিল। অথচ সংসারসন্তপ্ত মানবগণ, বিশেষতঃ নারীগণ, তাঁহার পূত স্পর্শে আসিয়া পরম শান্তি লাভ করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ভাবসমাধি কোন কোন দিন এত গভীর হইত যে, তাঁহার দেহজ্ঞান আসিতে অনেক সময় লাগিত। একদিন সেবিকা যোগীন মাকে ধ্যানান্তে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ও যোগীন, আমার হাত পা কই ?' যোগীন মা তখন সারদাদেবীর হাত পা টিপিয়া অতি কষ্টে তাঁহার দেহজ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁহার কারুণ্য ও মাতৃভাব এত সমৃদ্ধ হইয়াছিল যে, তিনি কোন কোন বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধও অগ্রাহ্য করিতেন। 'মা' বলিয়া ডাকিলেই তাঁহার মাতৃস্নেহ-সাগর হইতে অমৃতধারা প্রবাহিত হইত। সন্তানকে সান্ত্বনা ও শান্তিদানের জন্য তিনি পাগলিনীর মত অস্থিরা হইতেন। শ্বাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার সারদার বিয়ে হলো এক পাগলের সঙ্গে! মেয়েটী সন্তানের মুখ দেখতে পেলে না।' শ্রীরামকৃষ্ণ দূর হইতে তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'মা, তোমার মেয়ের এত ছেলে মেয়ে হবে যে, মা ডাকে সে অস্থির হয়ে উঠবে।' শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। দেশবিদেশের সহস্র সহস্র নরনারী সারদাকে জননীজ্ঞানে মাতৃসম্বোধন করিতেন।

১৮৮৫ খৃীঃ সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ গলরোগে আক্রান্ত হন। তখন তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে লইয়া যাওয়া হয়। সারদামণি পতির সেবার জন্য শ্যামপুকুরে আসিলেন। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানবাটীতে আনীত হন তখনও সারদাদেবী তথায় থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। পতির অন্তিম অসুখের সময় তিনি প্রাণপণে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করেন। সন্তান স্নেহের ন্যায় তাঁহার পতিভক্তি অতুলনীয় ছিল। কোন্ পত্নী ইন্দ্রিয়সুখের বা

অর্থাগমের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া পতির এমন সেবা করিতে পারেন? ১৮৮৬ খ্রীঃ আগস্ট মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পরদিন সারদা দেবী যখন বৈধব্যচিহ্ন ধারণ করিতে যাইতেছিলেন তখন তিনি সূক্ষ্ম দেহে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'তুমি কি করছ? আমি কোথায় গেছি? ওঘর থেকে এঘরে এসেছি।' ইহাতে সারদার শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। তিনি বড় লাল-পেড়ে শাড়ীর কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া পরিলেন। তখন হইতে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সরু-লাল-পেড়ে শাড়ী পরিতেন। বিধবার ন্যায় সাদা-পেড়ে কাপড় পরিবার চেষ্টা তিনি তাহার পর দুই একবার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নিষেধ করেন। পতিতে যাঁহার ঈশ্বর-জ্ঞান আছে, তিনি কখনো বিধবা হন না।

১৮৮৬ খ্রীঃ ৩০শে আগষ্ট সারদা দেবী শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। বৈদ্যনাথধাম, বারাণসী, ও অযোধ্যা দর্শনান্তে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। কাশীতে তিনি স্বামী ভাস্করানন্দ ও চামেলাপুরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাধু-গণকে দেখিয়া প্রীত হন। চামেলীপুরী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস-গুরু তোতাপুরীর গুরুভ্রাতা। চামেলীপুরীকে প্রণামান্তে সারদা দেবী জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাকে খেতে দেয় কে?' ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল চামেলীপুরী সহাস্যে উত্তর দিলেন 'অন্নপূর্ণা মায়ী দেতী হায়।' বৃন্দাবনে সারদা দেবী বৎসরাধিক কাল কঠোর তপস্যা করেন। উক্ত তীর্থে লালাবাবুর কুঞ্জে তাঁহার গভীর সমাধি লাভ হইয়াছিল। তথায় তপস্যাকালে তিনি নিত্য প্রার্থনা করিতেন, তিনি যেন কাহারো দোষ দেখিতে না পান। তাঁহার পরবর্তী জীবনে দেখা যায়, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের শত শত সাধু-ব্রহ্মচারী-ভক্তের কাহারো দোষ দেখিতেন না, প্রত্যেকের গুণটী মাত্র দেখিতেন। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে তিনি প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার জীবন যেন জ্যোৎস্নার মত শুভ্র, সুন্দর হয়। ঈশ্বর তাঁহার উভয় প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে হরিদ্বার ও বুদ্ধগয়াদি তীর্থ দর্শন করিয়া সারদামণি পিত্রালয়ে যান। দাক্ষিণাত্যের পুরী, রামেশ্বরাদি তীর্থেও তিনি পরে গিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন রামনাদের রাজা। মাদুরা রামনাদের অন্তর্গত। মাদুরার মীনাক্ষী দেবী দর্শনের জন্য সারদামণির বিশেষ সুবিধা হয় রামনাদাধিপতির সৌজন্যে। বেলুড় গ্রামে গঙ্গাতীরে এক বাগানবাড়ীতে কিছুদিন তিনি বাস করেন।

তথায় তাঁহার এই অলৌকিক অনুভূতি হয়। তিনি দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় দেহ গঙ্গাসলিলে মিশিয়া গেল। সেদিন হইতে তিনি কয়েকমাস গঙ্গায় স্নান করিতে পারেন নাই। রামকৃষ্ণময় সলিলে তিনি কিরূপে পদক্ষেপ করিবেন? শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তি ধীরে ধীরে সারদার মধ্যে অবতীর্ণা হইয়া লোক-কল্যাণ সাধনে নিরতা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যগণ তাঁহাকে বাগবাজারে একটি মঠে রাখিয়া যথাসাধ্য সেবা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দুই সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতকে সারদামণি মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন পতির নির্দেশে। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে যাইবার সময় সারদামণির আশীর্বাদ ও অনুমতি লইয়া যান। স্বামীজি পাশ্চাত্যবিজয়ের পর ভারতে ফিরিয়া গঙ্গাস্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্রে গুরুপত্নীর পাদবন্দনা করেন। সারদাদেবীকে কেন্দ্র করিয়াই বিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য সারদা দেবী সংঘ-জননীরূপে পূজিতা। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ধ্যানে এত তন্ময় থাকিতেন যে, তাঁহার হাবভাব, কথা-বার্তা, গলার স্বর পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের মত হইত। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া কখনো কখনো বলিতেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমি অভেদ। আমার আশিস তাঁহারই আশিস তুল্য অমোঘ মনে করিবে।' তিনি এত বিপুল আধ্যাত্মিকতার অধিকারিণী হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আশীর্বাদে পাপী ধার্মিক হইয়াছে, তাপীর প্রাণ জুড়াইয়াছে। শ্রীরাম-কৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ যে পাপীর জীবনে পরিবর্তন আনিতে পারেন নাই সারদা মাতার কৃপাকটাক্ষে তাঁহার সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইয়াছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁহার করুণা সকলের প্রতি সমান ভাবে প্রবাহিত হইত।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড়মঠে দুর্গাপূজার সময় সচন্দন জবা-পদ্ম-গোলাপ পুষ্প দ্বারা গুরুপত্নী সারদাকে পূজা করেন। শত শত ধনী-নির্ধন, দিশী-বিদেশী, পণ্ডিত-মূর্খ তাঁহাকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এত সম্মান শ্রদ্ধা পাইয়াও তিনি অবিচলিত, অনাসক্ত থাকিতেন। তিনি সর্বাবস্থায় সরলা স্নেহময়ী মাতার ন্যায় চলিতেন। বই-পড়া বিদ্যা তাঁহার অধিক ছিল না। কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে তাঁহার বুদ্ধি সমুজ্জ্বলা হওয়ায় ধর্ম-সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্নের সহজ মীমাংসা তিনি করিতে পারিতেন। 'দীক্ষা গ্রহণান্তে সাধন ভজনের আবশ্যকতা কি?' এই প্রশ্ন তাঁহাকে করা হইল। তিনি উত্তর দিলেন, 'টিকিট কিনিয়া ট্রেণে উঠিয়া যদি কোন যাত্রী

ঘুমাইয়া পড়ে সে গন্তব্য স্থানে নিশ্চয়ই পৌঁছিবে। কিন্তু ট্রেণে জাগিয়া থাকিলে সে পথে অনেক দুর্লভ দর্শনীয় স্থান দেখিবে।' এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বরের নাম জপ করিলে কি লাভ?' উত্তর আসিল, 'ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জলে পড়িলেই তোমার কাপড় ভিজিয়া যাইবে।'

সীতা, সাবিত্রী, মীরাবাই ও শ্রীরাধা প্রভৃতির ন্যায় সারদামণির চরিত্রে ভারতীয় নারীত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল! দেবীভাব ও মানবীভাবের অপূর্ব সামঞ্জস্য তাঁহার জীবনে দেখা যায়। একদা শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য সারদা দেবীর অনুমতি ভিক্ষা করেন। যুক্তি-বিচার-নৈপুণ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। তিনি সারদা দেবীর সহিত সাধ্যমত যুক্তিতর্ক করিয়াও স্বমত সমর্থন করিতে পারেন নাই। সারদা সরল সমাধান দানে তাঁকে নিরস্ত করেন। সারদা উচ্চমনা ছিলেন, ক্ষুদ্রতা বা নীচতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। মহাপাপ, মহাদোষ বা মহা অন্যায় করিয়াও লোকে তাঁহার কাছে দোষস্বীকার করিতে সংকুচিত হইত না। এত ক্ষমা, এত স্নেহ, এত দয়া ছিল যে, তাঁহাকে মানবী না বলিয়া দেবী বলাই যুক্তিসংগত।

সারদা ছিলেন মাতৃত্বের ঘনীভূত মূর্তি। কত মাতৃহীন নরনারী তাঁহার কাছে মাতৃস্নেহ পাইয়া মায়ের অভাব ভুলিয়াছে! তাঁহার স্নেহ লাভও খুব সহজ ছিল। মাতৃ-সম্বোধনেই তাঁহার হৃদয়-নির্ঝরিণী হইতে মাতৃ-স্নেহ ক্ষরিত হইত। তিনি যখন পিত্রালয়ে থাকিতেন তাঁহার বহু শিষ্যভক্ত তাঁহার কাছে যাইতেন। তিনি তাঁহাদের জন্য রান্নাদি করিতেন, আহারান্তে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট-সংযুক্ত বাসনাদিও ধুইতেন। ভক্তগণ নিষেধ করিলে তিনি সস্নেহে বলিতেন, 'বাবা, আমি যে তোমাদের মা!' ভগ্নী নিবেদিতা, ভগ্নী ক্রীশ্চিন ও ভগ্নী দেবমাতা প্রমুখ বহু বিদেশিনীও তাঁহার কাছে সমান ভাবে স্নেহসেবা পাইতেন। তিনি তাঁহার অবাঙ্গালী বা বিদেশিনী শিষ্যাগণের ভাষা না বুঝিলেও তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া কথা বলিতেন। একটি মুসলমান শ্রমিক তাঁহার পিত্রালয়ে কাজ করিত। একদিন সেই শ্রমিকটী উক্ত গৃহে আহার করিতেছিলেন। তাঁহার কোন ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রমিকটিকে অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশনে নিযুক্তা। জাত্যাভিমানহেতু ভ্রাতুষ্পুত্রী দূর হইতে ভাততরকারী শ্রমিকটীর পাত্রে ফেলিয়া দিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া সারদামণির মাতৃহৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি নিজে উঠিয়া মুসলমানটীকে সস্নেহে পরিবেশনপূর্বক পরিতৃপ্ত করিয়া

খাওয়াইলেন। শুধু তাহাই নহে, তাহার খাওয়া হইয়া গেলে সেই স্থানটি পরিষ্কার করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী বলিলেন, 'পিসী মা, তুমি কি করছ? তোমার জাতি যাবে।' মাতা সাহ্লাদে মধুর হাস্যে উত্তর দিলেন, 'এও আমার ছেলে।'

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রায় ৬৭ বৎসর বয়সে সারদামণি দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পাঁচদিন পূর্বে তিনি এক রোরুদ্যমানা শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার ভয় কি? তুমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছ। দুনিয়াকে স্নেহে, সেবায় আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়। এই জগৎ তোমার আপনার, আত্মীয়। প্রীতিতে মানুষ আপনার হয়।' সারদামণির জীবনের অভিজ্ঞতা এই উক্তিতে প্রকাশিত। ভগ্নী নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করেন, সারদামণি কি অতীতের আদর্শ, না বর্তমানের বা ভবিষ্যতের দৃষ্টান্ত? সারদা প্রাচীনা হইয়াও নবীনা ছিলেন। ভারতের প্রাচীন আদর্শটী যুগোপযোগী হইয়া সারদার জীবনে প্রকটিত। তিনি আধুনিক হিন্দু নারীর সমুজ্জ্বল উদাহরণ। ওঁ মা।

ষোড়শ মণি

সংঘমিত্রা

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে সংঘমিত্রার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কারণ, সম্ভবতঃ একমাত্র সন্ন্যাসিনী সংঘমিত্রাই ধর্মপ্রচারার্থ ভারতবহির্ভূত দেশে যাইয়া তথায় অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যান এবং দেহপাত করেন। সিংহলের ইতিহাসে তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। 'মহাবংশ' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে সংঘমিত্রার কথা পাওয়া যায়। উক্ত পালিগ্রন্থের লেখক বলেন, "সংঘমিত্রা মহাবোধি লাভ করিয়াছিলেন। সিংহলে অবস্থানকালে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন। সিংহলের রাজা তিষ্য আমরণ তাঁহার সশ্রদ্ধ সৎকার এবং মহাসমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।" অনুরাধাপুরে সংঘমিত্রার স্মৃতিস্তম্ভ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

সংঘমিত্রা ছিলেন মৌর্যসম্রাট অশোকের কন্যা। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৩ অব্দে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট হইবার পাঁচ বৎসর পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা এই শুভ সময়ে লালিতপালিত হন। সংঘমিত্রা অতিশয় সুন্দরী, ত্যাগিনী, তেজস্বিনী এবং ধর্মপ্রাণা ছিলেন। ধর্মনিষ্ঠ পিতামাতার ক্রোড়ে লালিতপালিত হওয়ায় বাল্য হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। মহেন্দ্রের বয়স যখন বিশ বৎসর এবং সংঘমিত্রার বয়স আঠার বৎসর তখন সম্রাট মহেন্দ্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের এক আচার্য সম্রাটের নিকটে আসিয়া বলেন, 'মহারাজ, যিনি ধর্মসেবায় স্বীয় পুত্র ও কন্যাকে সমর্পণ করেন, তিনিই বৌদ্ধ ধর্মের বাস্তবিক মিত্র'। বৌদ্ধাচার্যের এই বাক্য অশোকের হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ'? পিতার প্রশ্নে পুত্র ও কন্যার হৃদয় উল্লসিত হইল। তাঁহারা পূর্ব হইতেই ধর্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু সম্রাটের সন্তান বলিয়া তাঁহারা আশা করিতে পারেন নাই যে, বৌদ্ধ সংঘে যোগদানের সৌভাগ্য তাঁহাদের

হইবে। সেই সৌভাগ্য অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিলেন। উভয়ে উত্তর দিলেন, 'পিতঃ, আমরা যদি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হইয়া ভগবান বুদ্ধের ধর্ম সাধন ও প্রচারার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা বড় সৌভাগ্য আমাদের আর কি হইতে পারে? আপনার অনুমতি পাইলে আমরা সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক মানবজন্ম সফল করিব।'

পুত্র ও কন্যার আন্তরিক সম্মতি পাইয়া সম্রাটের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা ভিক্ষুসংঘে যোগদান করিবেন, এই শুভ সংবাদ বিদ্যুৎবেগে পাটলীপুত্র নগরে ও মগধরাজ্যে প্রচারিত হইল। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে মহেন্দ্রের নাম হইল ধর্মপাল এবং সংঘমিত্রার নাম আয়ুপালী। মহেন্দ্র ভিক্ষুসংঘে এবং সংঘমিত্রা ভিক্ষুণীসংঘে থাকিয়া ধর্মসাধনায় এত উন্নত হইলেন যে, তাঁহাদের মুখমণ্ডল আধ্যাত্মিক আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বত্রিশ বৎসর বয়সে মহেন্দ্র ধর্মপ্রচারার্থ সিংহলে প্রেরিত হন। সিংহলের রাজা তিষ্য ভিক্ষু মহেন্দ্রকে সাদর সম্বর্ধনা করেন। সিংহলে সহস্র সহস্র নরনারী মহেন্দ্রের উপদেশ শ্রবণে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। কলম্বো সহরে মহেন্দ্রের নামে একটি বৃহৎ ভিক্ষু মহাবিদ্যালয় আছে। অল্পকাল পরে সিংহলের রাজকুমারী অনুলা পাঁচ শত সখীর সহিত ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণের শুভ সংকল্প করেন। তখন মহেন্দ্র নারীদের মধ্যে উত্তমরূপে ধর্মপ্রচারের জন্য শিক্ষিতা ও ধর্মশীলা ভিক্ষুণীর নিরতিশয় প্রয়োজন অনুভব করিলেন। তিনি স্বীয় ভগ্নী সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠাইবার জন্য পিতা অশোককে পত্র দিলেন। ভিক্ষুণী সংঘমিত্রার হৃদয়ে ধর্মের সাধন ও প্রচার ব্যতীত অন্য কোন বাসনা ছিল না। ধর্ম-প্রচারার্থ ভ্রাতা মহেন্দ্রের নিকট সিংহল দ্বীপে যাইবার নির্দেশ পাইয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে অধীর হইল। তিনি অনতিবিলম্বে সিংহলে উপস্থিত হইলেন। ধর্মপ্রচারার্থ ভারতের বাহিরে যাইবার পরম সৌভাগ্যলাভ প্রথমে করিলেন ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা। তাঁহার তেজস্বিনী মূর্তি, তপস্বিনী বেশ এবং অপূর্ব ধর্মশ্রী দেখিয়া সিংহলের নরনারীগণ চিত্রবৎ মুগ্ধ হইলেন। তিনি শীঘ্রই অনুরাধাপুরে একটী ভিক্ষুণীসংঘ স্থাপন করেন এবং সিংহল দ্বীপের গৃহে গৃহে যাইয়া নারীগণের নিকট ভগবান বুদ্ধের অমৃতবাণী প্রচার করেন। সিংহলে অদ্যাপি তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুণীসংঘ এখনও উক্ত দ্বীপে প্রভাবশালী। বহু বৎসর সিংহলে ধর্মপ্রচারান্তে তিনি তথায় দেহরক্ষা করেন।

ভারতনারীর যে আদর্শ সংঘমিত্রা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ব ও অনুকরণীয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। সংঘমিত্রা পৌরাণিক নহেন, তিনি ঐতিহাসিক নারী। সন্ন্যাসিনী সংঘমিত্রার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে কোন ভারতরমণী এ পর্যন্ত অগ্রসর হন নাই। ইহা অত্যুক্তি নহে। কারণ, বিগত বাইশ শতাব্দীর মধ্যে কয়জন ভারতীয় সন্ন্যাসিনী ভারত ধর্মপ্রচারার্থ বিদেশে গিয়াছেন? অথচ দেশে শিক্ষিতা সন্ন্যাসিনীর অভাব নাই। শত শত খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী ধর্মপ্রচারার্থ সাত সমুদ্রের পার হইতে ভারতে আসিতেছেন। কিন্তু কয়জন ভারতীয় সন্ন্যাসিনী ধর্মপ্রচারার্থ বিদেশে গিয়াছেন? স্বাধীন ভারতের শিক্ষিতা নারীগণ কি ভিক্ষুণী সংঘমিত্রার আদর্শে উদ্বুদ্ধা হইবেন না?

সমাপ্ত



PRESS
LARLY BOOKS
'ark, Laxmi Nagar, Delhi-110092
E-mail : authorspress@yahoo.com